অংকের ধাঁধা

ইয়াকভ পেরেলমান

Scanned by CamScanner

অংকের ধাঁধা

মূল
ইয়াকভ পেরেলমান

সম্পাদনা
সুব্রত দেব নাথ
সৌমিত্র চক্রবর্তী

অনুপম প্রকাশনী

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

ইয়াকভ পেরেলমানের বইগুলো জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও গণিত প্রকাশনায় পৃথিবীর অন্যতম শীর্যস্থানীয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় সেই বিশাল রচনাসম্ভারের খুব সামান্যই পাঠকের কাছে পৌছেছে। বাংলাদেশের বর্তমান গণিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গণিত সাহিত্যের চোখ-ধাঁধানো বিশ্বসম্ভারের সাথে গণিতপিপাসুদের সাক্ষাতের সুব্যবস্থা করে দেওয়া আজ সময়ের দাবি। এই বইটি বাংলা ভাষায় পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করছি। বইটির রচনাশৈলী সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে যাওয়াই উচিত হবে না, কারণ এর অসাধারণত্ব কেবল বইটি পড়েই অনুধাবন করা সম্ভব এবং ভাষায় প্রকাশ করা নিতান্তই অসম্ভব। ইয়াকভ পেরেলমানের বই পড়ার অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে তাঁরা আশাকরি আমার সাথে একমত হবেন। বইটি সম্পাদনা করার সময় চেষ্টা করা হয়েছে যাতে করে এর মূল সাহিত্যরস যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ থাকে। জানি না এক্ষেত্রে আমার সফলতা-ব্যর্থতার অনুপাত কত! সে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। পাঠক যদি বইটি পড়ে চিন্তাজগতের সামান্যতম ঐশ্বর্যের সন্ধানও পান তাহলে সেটাই আমার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট হবে। প্রকাশক মিলন নাথের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এই বই প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল। এছাড়াও বইটি প্রকাশের সর্বস্তরে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি মার্জেন-প্রাইম-সমান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সবার জীবন হোক পাইয়ের মতো সুন্দর, সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জীবন-চলার-পথ হোক কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের মতো সহজ এবং স্বাভাবিক সংখ্যার মতো সাবলীল।

ময়মনসিংহ
২৪ অক্টোবর, ২০০৮

সুব্রত দেব নাথ
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি

সৌমিত্র চক্রবর্তী
চতুর্থ বর্ষ
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ

Scanned by CamScanner

বিষয় সূচি

- ভূমিকা

ছুটির দিনের ধাঁধা

১. জংলা জমির কাঠবিড়ালী ১১
২. স্কুলের চক্র ১৩
৩. কে বেশি গুনেছিল? ১৪
৪. নাতি ও ঠাকুর্দা ১৪
৫. ট্রেনের টিকিট ১৪
৬. হেলিকপ্টারের পাল্লা ১৪
৭. ছায়া ১৫
৮. দেশলাই কাঠির ধাঁধা ১৬
৯. 'অদ্ভুত' এক গাছের গুঁড়ি ১৬
১০. ডিসেম্বরের ধাঁধা ১৭
১১. অঙ্কের খেলা ১৭

১-১১ নম্বর ধাঁধার উত্তর ১৯

১২. হারানো সংখ্যা ২৪
১৩. কার কাছে আছে? ২৬

আরও এক সারি ধাঁধা

১৪. দড়ি ২৮
১৫. মোজা আর দস্তানা ২৮
১৬. চুলের আয়ু ২৮
১৭. মাইনে ২৯
১৮. স্কিইং ২৯
১৯. দু'জন শ্রমিক ২৯
২০. টাইপ করা ২৯
২১. দাঁতওয়ালা চাকা ২৯
২২. বয়স কত? ২৯
২৩. ইভানোভ পরিবার ৩০
২৪. কেনাকাটা ৩০

১৪-২৪ নম্বর ধাঁধার উত্তর ৩০

গুনতি

২৫. তুমি গুনতে জান? ৩৬
২৬. বনের গাছ গুনব কেন? ৩৮

ঠকানো সংখ্যা

২৭. পাঁচ রুবলের বদলে একশো রুবল ৪০
২৮. এক হাজার ৪০
২৯. চব্বিশ ৪০
৩০. তিরিশ ৪০
৩১. লুপ্ত সংখ্যা বের করা ৪১
৩২. সংখ্যাগুলো কী বলো তো? ৪১
৩৩. ভাগ ৪১
৩৪. ১১ দিয়ে ভাগ ৪১
৩৫. মজার গুণন ৪২
৩৬. সংখ্যার ত্রিভুজ ৪২
৩৭. আরও একটা সাংখ্যিক ত্রিভুজ ৪২
৩৮. যাদু-তারা ৪২

২৭-৩৮ নম্বর ধাঁধার উত্তর ৪৩

দানবীয় সংখ্যা

৩৯. একটি লাভজনক লেনদেন ৪৮
৪০. গুজব ৫২
৪১. সাইকেলের জুয়াচুরি ৪৫
৪২. পুরস্কার ৫৮
৪৩. দাবাখেলার কাহিনী ৪৩
৪৪. দ্রুত বংশ বিস্তার ৬৬
৪৫. বিনা পয়সার ভোজ ৭০
৪৬. মুদ্রার জাদু ৭৪
৪৭. বাজি ধরা ৭৮
৪৮. আমাদের চারপাশে দানবীয় সংখ্যাগুলো ৮১

যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াও মাপা যায় কি করে?

৪৯. পদক্ষেপ দূরত্বের হিসেব ৮৪
৫০. জীবন্ত মাপকাঠি ৮৫

Scanned by CamScanner

মাথা ঘামানো জ্যামিতি

৫১. ঠেলাগাড়ি ৮৭
৫২. বিবর্ধক কাচের মধ্য দিয়ে ৮৭
৫৩. কতগুলো ধার? ৮৭
৫৪. অর্ধচন্দ্র ৮৮
৫৫. দেশলাই কাঠির খেলা ৮৮
৫৬. আরও একটা দেশলাই কাঠির খেলা ৮৮
৫৭. মাছির রাস্তা ৮৯
৫৮. ছিপি দিতে পারো একটা? ৮৯
৫৯. দ্বিতীয় ছিপি ৯০
৬০. তৃতীয় ছিপি ৯০
৬১. মুদ্রার খেলা ৯০
৬২. মিনারের উচ্চতা ৯০
৬৩. একই ধরনের ক্ষেত্র ৯০
৬৪. তারের ছায়া ৯০
৬৫. একটা ইট ৯১
৬৬. দৈত্য আর বামন ৯১
৬৭. দুটো তরমুজ ৯১
৬৮. দুটো ফুটি ৯২
৬৯. একটা চেরি ফল ৯২
৭০. আইফেল টাওয়ার ৯২
৭১. দুটো কড়াই ৯২
৭২. শীতকালে ৯২

৫১-৭২ নম্বর ধাঁধার উত্তর ৯২

বৃষ্টি ও তুষারের জ্যামিতি

৭৩. বৃষ্টি মাপার যন্ত্র : প্লুভিওমিটার ১০৩
৭৪. কতটা বৃষ্টি হলো? ১০৫
৭৫. কতটা তুষার? ১০৬

গণিত ও মহাপ্লাবন

৭৬. মহাপ্লাবন ১০৯
৭৭. মহাপ্লাবন হওয়া কি সম্ভব? ১১০
৭৮. ঐরকম একটা জাহাজ ছিল কি? ১১১

পাঁচমিশালী ধাঁধা

৭৯. শেকল ১১৩
৮০. মাকড়সা আর গুবরেপোকা ১১৩
৮১. বর্ষাতি, টুপি আর গ্যালোস ১১৪
৮২. মুরগির আর পাতিহাঁসের ডিম ১১৪
৮৩. আকাশভ্রমণ ১১৪
৮৪. উপহারের টাকা ১১৪
৮৫. দুটো ড্রাফটের খুঁটি ১১৪
৮৬. দুটো অঙ্ক ১১৫
৮৭. এক ১১৫
৮৮. পাঁচটা ৯ ১১৫
৮৯. দশটা অঙ্ক ১১৫
৯০. চারটে উপায় ১১৫
৯১. চারটে ১ ১১৫
৯২. মজার ভাগ ১১৫
৯৩. আর একটা ভাগ অঙ্ক ১১৬
৯৪. কতটা পাওয়া যাবে? ১১৬
৯৫. ঐ ধরনেরই আর একটা ১১৬
৯৬. একটা উড়োজাহাজ ১১৬
৯৭. দশ লাখ জিনিস ১১৬
৯৮. পথের সংখ্যা ১১৭
৯৯. ঘড়ির মুখ ১১৭
১০০. আট-মাথা তার ১১৭
১০১. সংখ্যা চক্র ১১৮
১০২. তেপায়া ১১৮
১০৩. কোণ ১১৮
১০৪. বিষুবরেখার উপর ১১৮
১০৫. ছ'টা সারি ১১৯
১০৬. ভাগটা করবে কী করে? ১১৯
১০৭. ক্রুশ আর চাঁদের ফালি ১১৯

৭৯–১০৭ নম্বর ধাঁধার উত্তর ১১৯

Scanned by CamScanner

ছুটির দিনের ধাঁধা

বৃষ্টি পড়ছে। বিশ্রামভবনে দুপুরবেলায় সবেমাত্র খেতে বসেছি আমরা। এমন সময় আমাদের ভেতর একজন জানাতে চাইল যে তার ভোরবেলার ঘটনাটা আমরা সবাই শুনতে চাই কি না।

আমরা তো সব্বাই রাজি হলাম। সে শুরু করল।

১. জংলা জমির কাঠবিড়ালী

"একটা কাঠবিড়ালীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছে। জঙ্গলের সেই গোলাকার ফাঁকা জায়গাটা তো চেনো তোমরা সবাই—মাঝখানে যার একটামাত্র বার্চ গাছ? এই গাছটাতেই একটা কাঠবিড়ালী লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল আমার কাছ থেকে। সবেমাত্র একটা ঝোপ থেকে বেরিয়েছি, দেখি গাছের গুঁড়িটার পেছন থেকে ওর নাক আর চকচকে দুটো ছোট চোখ উঁকি মারছে। খুদে প্রাণীটাকে দেখতে ইচ্ছে হল। তাই গোল জমিটার কিনারা-বরাবর চক্কর দিতে লাগলাম। যাতে ভয় না পেয়ে যায়, তাই খেয়াল করে একটু দূরে দূরেই থাকতে হল। পুরো চারবার ঘুরে এলাম, কিন্তু খুদে শয়তানটা সন্দেহমাখা দৃষ্টি নিয়ে দূরে গাছের পেছনদিকে হটে যেতে লাগল। অনেক চেষ্টাচরিত্তির করেও ওর পিঠটা দেখতে পেলাম না।"

"কিন্তু তুমিই তো বললে এইমাত্র যে গাছটাকে চারবার চক্কর দিয়েছ," প্রশ্ন করল শ্রোতাদের একজন।

"গাছের চারপাশে ঠিকই, কিন্তু কাঠবিড়ালীকে ঘিরে তো নয়!"

"কিন্তু কাঠবিড়ালীটা তো গাছের উপরই ছিল, তা-ই না?"

"তাতে কী?"

"তার মানেই হল তুমি কাঠবিড়ালীটাকেও ঘুরে এসেছ।"

"বা রে! ওর পিঠটাই দেখতে পেলাম না, আর তুমি বলছ ওর চারপাশে ঘুরে এলাম?"

"ঘুরে আসার সঙ্গে পিঠের আবার কী সম্পর্ক? গোল জমিটার মাঝখানের গাছটায় ছিল কাঠবিড়ালী। সেই গাছটাকে বেড় দিয়ে এলে তুমি। তার মানেই হল কাঠবিড়ালীর চারপাশে তুমি ঘুরে এলে।"

"আরে না, তা নয়। ধরো, তোমার চারপাশে ঘুরছি আর তুমিও এমনভাবে ঘুরছ যাতে তোমার মুখটাই দেখতে পাচ্ছি কেবল। তার মানে তোমাকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করা হল বলতে চাও?"

"নিশ্চয়ই, তা ছাড়া আর কী?"

Scanned by CamScanner

"তার মানে, তোমার পেছনদিকে কোনো সময়ই পৌঁছতে পারলাম না বা তোমার পিঠটাও দেখতে পেলাম না, তবু তোমাকে ঘুরে আসা হয়ে গেল?"

"পিঠ-টিঠ ভুলে যাও। আমার চারধারে ঘুরে এলে—এটাই বড় কথা। পিঠের জন্য কি ঠেকে থাকছে?"

"থামো বাবা, প্রদক্ষিণ করা কাকে বলে বলো তো? এটাকে আমি যেভাবে বুঝি, তা হল—কোনো জিনিসের চারপাশে এমনভাবে ঘুরে আসা যাতে সে-জিনিসটাকে সব দিক থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক বলিনি, প্রফেসর?" আমাদের খাবার টেবিলে একজন বৃদ্ধের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটি করল সে।

অধ্যাপক উত্তর দিলেন, " তোমাদের সমস্ত আলোচনা আসলে একটিমাত্র শব্দকে নিয়ে। 'প্রদক্ষিণ' শব্দের সংজ্ঞা সম্পর্কে প্রথমে একমত হতে হবে তোমাদের। ' কোনো কিছুর চারপাশে প্রদক্ষিণ করা' বলতে কী বোঝ তোমরা? কথাটা থেকে দু'ধরনের অর্থ বোঝা যায়। প্রথমটা হল, একটা বৃত্তের মাঝখানে আকা কোনো জিনিসকে ঘুরে আসা। দ্বিতীয়টা হল, জিনিসটার চারপাশে এমনভাবে ঘোরা যাতে তার সব দিকটাই দেখতে পাওয়া যায়। যদি প্রথম অর্থটাই ধরতে চাও, তা হলে কাঠবিড়ালীকে চারবার ঘোরা হয়েছে তোমার। যদি দ্বিতীয় অর্থটাকে মেনে নাও, তা হলে কাঠবিড়ালীর চারপাশে মোটেই ঘোরা হয়নি। তোমরা দু'জনে যদি একই ভাষায় কথা বলো, আর শব্দগুলিকে একইভাবে মানে করে নাও তা হলে সত্যিই বিতর্কের আর কোনো প্রয়োজন থাকে না।"

"আচ্ছা, মেনে নিলাম কথাটার দুটো অর্থই হয়। কিন্তু এর ভেতর সঠিক কোনটা?"

"এভাবে প্রশ্ন করাটা তো ঠিক হল না তোমার! যে-কোনোটাকেই মেনে নিতে পার তোমরা। কথাটা হল, দুটোর ভেতর সাধারণত কোন অর্থটাকে মেনে নিই আমরা? আমার মতে প্রথমটা। কেন তা বলছি। তোমরা জানো সূর্য নিজের চারপাশে পুরো পাক খেয়ে আসে ২৫ দিনের একটু বেশি সময়ে ..."

"সূর্যও ঘোরে নাকি?"

"নিশ্চয়ই, ঠিক পৃথিবীর মতোই ঘোরে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করো, এতে সূর্যের ২৫ দিনের বদলে লাগছে ৩৬৫ $\frac{১}{৪}$ দিন, অর্থাৎ পুরো এক বছর। ঘটনাটা যদি এমন দাঁড়ায়, তা হলে পৃথিবী থেকে সূর্যের একটা দিক, অর্থাৎ 'মুখটাই' কেবল দেখা যাবে। তবু কেউ কি জোর করে বলতে পারত যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে না?"

"ঠিক, এতক্ষণে বুঝলাম আমি কাঠবিড়ালীর চারপাশেই ঘুরে এসেছি তা হলে।"

আমাদের একজন সঙ্গী চেঁচিয়ে উঠল, "ভাই, আমার একটা কথা আছে। বৃষ্টি পড়ছে, কেউই বাইরে বের হচ্ছি না। তা হলে, সবাই মিলে ধাঁধার খেলা চালানো যাক। কাঠবিড়ালীর ধাঁধাটা দিয়ে বেশ শুরু করা গেছে। এসো, আমরা সবাই কিছু বুদ্ধির খেলা বের করি। প্রফেসর হবেন আমাদের প্রধান বিচারক।"

Scanned by CamScanner

"বীজগণিত বা জ্যামিতির ব্যাপার-ট্যাপার থাকলে আমি কেটে পড়ছি," বলল একটি তরুণী।

"আমিও!" তার সঙ্গে সুর মেলাল আর একজন।

"না, সব্বাইকেই খেলতে হবে! অবশ্য কথা দিচ্ছি খুব সোজা আর সাধারণ নিয়মগুলি ছাড়া বীজগণিত বা জ্যামিতির ভেতর যাব না আমরা। আপত্তি আছে কারও?"

"না-না," সবাই চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে, "তা হলে শুরু করা যাক!"

২. স্কুলের চক্র

একজন তরুণ পাইওনয়ির শুরু করল, "আমাদের স্কুলে পড়াশুনোর বাইরে পাঁচটা চক্র আছে। এগুলি হল–ফিটারের কাজ শেখার, কাঠের কাজ শেখার, ফোটোগ্রাফি শেখার, দাবাখেলা শেখার আর সমবেত সঙ্গীত শেখার চক্র। ফিটারের কাজ শেখার চক্রের অধিবেশন হয় একদিন অন্তর, কাঠের কাজ শেখার চক্রের প্রতি তৃতীয় দিনে, ফোটোগ্রাফি শেখার চক্রের প্রতি চতুর্থ দিনে, দাবা খেলোয়াড়দের প্রতি পঞ্চম দিনে আর সমবেত সঙ্গীতচক্রের প্রতি ষষ্ঠ দিনে। ১ জানুয়ারিতে প্রতিটি চক্রের প্রথম অধিবেশন হল। তার পর থেকে নিয়মমতো প্রত্যেকের বৈঠক হতে থাকল। প্রশ্ন হল, প্রথম তিন মাসে মোট কতবার সব চক্রই একই দিনে সভা করেছিল (১ জানুয়ারি বাদ দিয়ে)?"

"বছরটা কি লিপইয়ার (অধিবর্ষ)?"

"উঁহু।"

"তা হলে প্রথম তিন মাসে মোট ৯০ দিনই ছিল?"

"ঠিক ধরেছ।"

অধ্যাপক কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, "আরও একটা প্রশ্ন জুড়ে দিচ্ছি এর সঙ্গে। সেটা হল : প্রথম তিন মাসে মোট কতদিন কোনো দলেরই বৈঠক হয়নি?"

"তা হলে নিশ্চয়ই একটা ফাঁকি আছে এর ভেতরে? পাঁচটি চক্রের সবারই বৈঠক হবে এমন আর কোনো সন্ধে বেলা আসবে না, বা একেবারেই কোনো বৈঠক হবে না এমন সন্ধে বেলাও পাওয়া যাবে না। এ তো পরিষ্কার!"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলেন অধ্যাপক।

"তা জানি না, তবে একটা ফাঁকির গন্ধ পাচ্ছি যেন!"

"এটা কোনো যুক্তি নয়। সন্ধে বেলা দেখা যাবে আপনার পাওয়া গন্ধটা ঠিক কি না। এবার আপনার পালা!"

এ খেলার কথাটা যে তুলেছিল সে বলল, "জবাব এখন বলা হবে না। বেশ কিছু সময় নিয়ে ভাবব আমরা। রাতে খাবার সময় সব উত্তর জানা যাবে।"

Scanned by CamScanner

৩. কে বেশি গুনেছিল?

"দু'জন লোক, একজন দাঁড়িয়েছিল তার বাড়ির দরজায়, অন্যজন পায়চারি করছিল সামনের রাস্তায়। তারা দু'জনেই পুরো একঘন্টা ধরে রাস্তার লোকদের গুনতি করেছিল। বলো তো, কে বেশি গুনেছিল?"

খাবার টেবিলের শেষ দিক থেকে উত্তর দিল একজন, " যে পায়চারি করছিল সে। এ তো খুবই সোজা।"

অধ্যাপক বললেন, "রাতে খাবার সময় উত্তরটা শুনব আমরা। পরের ধাঁধাটা বলো এবার।"

৪. নাতি ও ঠাকুর্দা

"১৯৩২ সালে আমার বয়স ছিল আমার জন্মসালের শেষ দু'সংখ্যার সমান। এই অদ্ভুত ঘটনাটা ঠাকুর্দাকে শোনাতে তিনি আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে বললেন–তাঁর নিজের বয়সেরও নাকি ঐ একই হিসাব দাঁড়াচ্ছে। আমি ভেবে দেখলাম তা অসম্ভব..."

"একেবারে অসম্ভব," কার যেন গলা শোনা গেল।

"বিশ্বাস করো, এটা খুবই সম্ভব আর ঠাকুর্দা তা প্রমাণও করেছিলেন। তা হলে বলো তো ১৯৩২ সালে আমাদের কার বয়স কত ছিল?"

৫. ট্রেনের টিকিট

এরপর শুরু করল একটি মেয়ে, "আমার কাজ রেলের টিকিট বিক্রি করা। সবাই ভাবে, কাজটা বুঝি খুবই সোজা। একটা ছোট্ট স্টেশনেও যে কতগুলি টিকিট বিক্রি করতে হয়, বোধহয় সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই তাদের। আমাদের লাইনে আছে ২৫টা স্টেশন। আর আপ-ডাউন মিলিয়ে প্রতিটি জায়গার জন্য আছে আলাদা টিকিট। বলতে পারে আমাদের লাইনের স্টেশনগুলোর জন্য কত ধরনের টিকিট আছে?"

একজন বিমানচালকের দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক বললেন :

"এরপর তোমার পালা।"

৬. হেলিকপ্টারের পাল্লা

"লেনিনগ্রাদ থেকে একটা হেলিকপ্টার রওনা হল উত্তর দিকে। ৫০০ কিলোমিটার যাবার পর তা পূর্বদিকে ঘুরে উড়ে গেল আরও ৫০০ কিলোমিটার। তারপর গতি পরিবর্তন করল দক্ষিণদিকে, এগিয়ে গেল ৫০০ কিলোমিটার। শেষে ৫০০ কিলোমিটার পশ্চিমে গিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। প্রশ্নটা হল, হেলিকপ্টারটা নামল কোথায়? লেনিনগ্রাদের পশ্চিমে, পূর্বে, উত্তরে, না দক্ষিণে?"

Scanned by CamScanner

একজন বলে উঠল, "এ তো সোজা, ৫০০ পা সামনে, ৫০০ পা ডানে, পেছনদিকে ৫০০, তারপর বাঁদিকে আবার ৫০০। তার মানেই যেখান থেকে রওনা হয়েছিলে সেখানেই এসে পৌঁছল!"

"খুব সোজা বুঝি! তা হলে আপনার মতে, কোথায় নামল হেলিকপ্টারটা?"

"ঠিক লেনিনগ্রাদেই, তা ছাড়া আবার কোথায়?"

"উঁহু, হল না!"

"তা হলে, বুঝতে পারছি না!"

"ধাঁধাটায় কোথাও চালাকি আছে একটা," বলল আর একজন, "ওটা লেনিনগ্রাদে নামেনি বুঝি?"

"আর একবার বলবে ধাঁধাটা?"

বিমানচালক ছেলেটি বলল আর একবার। শুনে তো মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল সবাই।

"ঠিক আছে, জবাব ভেবে বের করতে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে। পরের ধাঁধাটা শোনা যাক তা হলে," বললেন অধ্যাপক।

৭. ছায়া

পরের ছেলেটি বলতে লাগল, "আমার ধাঁধাটাও একটা হেলিকপ্টার নিয়ে। বলো তো কোনটা বেশি লম্বা, একটা হেলিকপ্টার, না তার ঠিক ছায়াটা?"

"শুধু এই?"

"শুধু এই।"

"হেলিকপ্টার থেকে তার ছায়াটাই সাধারণত লম্বা! সূর্যের আলো তো পাখার মতোই ছড়িয়ে পড়ে, তা-ই না?" সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল একজন।

"আমি কিন্তু তা বলব না," বলে উঠল আর একজন, "সূর্যরশ্মি হল সমান্তরাল, তার মানেই হেলিকপ্টার আর তার ছায়া সমান মাপেরই হবে।"

"কী যে বলো"! মেঘের পেছন থেকে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়তে দেখেছ কখনো? তা হলে, দেখেছ বোধহয় কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে তারা। মেঘের ছায়াটা যেমন মেঘ থেকে বড় হয়, হেলিকপ্টারের ছায়াটাও তেমনি হেলিকপ্টারটা থেকে বেশ বড়ই হবে।"

"তা হলে নাবিক, জ্যোতির্বিদ, এদের মতো লোকেরা সূর্যরশ্মিকে সমান্তরাল বলে কেন?"

অধ্যাপক আর একজনকে তাঁর ধাঁধাটা বলতে বলে তর্কটা থামিয়ে দিলেন।

Scanned by CamScanner

৮. দেশলাই কাঠির ধাঁধা

একটি ছেলে দেশলাইয়ের বাক্সটা টেবিলের ওপর খালি করে কাঠিগুলোকে ভাগ করল তিনটি ভাগে।

ঠাট্টা করে প্রশ্ন করল একজন, "অগ্নিকাণ্ড-টাণ্ড ঘটাতে যাচ্ছ না তো ভাই?"

"না-না, এগুলো সব মগজ ঘামানোর জন্যে। এই হল, তিনটে ভাগ। ভাগগুলো সমান নয়। সবসুদ্ধ কাঠি আছে ৪৮টা। প্রতি ভাগে কটা আছে তা অবশ্য বলব না আমি। এবার সবাই নজর দাও ভালো করে। দ্বিতীয় ভাগে যতটা কাঠি আছে প্রথম ভাগ থেকে ততটা নিয়ে রাখলাম দ্বিতীয় ভাগে। তারপর তৃতীয় ভাগে যতটা আছে ততটা কাঠি দ্বিতীয় ভাগ থেকে নিয়ে রাখলাম তৃতীয় ভাগে। সবশেষে প্রথম ভাগে যে-কয়টা কাঠি পড়েছিল তৃতীয় ভাগ থেকে সে-কয়টা নিয়ে চালান করে দিলাম প্রথম ভাগে। এইসব কাণ্ড করলে পর তিনটে ভাগেই কাঠির সংখ্যা হবে সমান-সমান। তা হলে বলো, তো, প্রথমে প্রতি ভাগে কটা করে কাঠি ছিল?

৯. 'অদ্ভুত' এক গাছের গুঁড়ি

পরের ছেলেটি শুরু করল, "এই ধাঁধাটা গাঁয়ের এক অঙ্কের পণ্ডিত করতে দিয়েছিলেন আমাকে।"

আসলে এটা একটা মজার গল্প। একদিন এক কৃষকের সঙ্গে এক বুড়োর দেখা হল বনের ভেতর। কথাবার্তা শুরু হতে বুড়ো বলল :

"এই বনে একটা অদ্ভুত ছোট্ট গাছের গুঁড়ি আছে। দরকারমতো এটি মানুষকে সাহায্য করে।"

"তা-ই নাকি? কী করে? অসুখবিসুখ সারায় বুঝি?"

"না, ঠিক তা নয়। এটি মানুষের টাকা দ্বিগুণ করে দেয়। টাকার থলিটা শেকড়ের ভেতর রেখে একশো পর্যন্ত গুনে যাও, তার পরেই দেখতে পাবে টাকাটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এক অদ্ভুত গুঁড়ি হে!"

কৃষক তো উৎসাহের চোটে বলে উঠল, "পরীক্ষা করে দেখতে পারি না?"

" কেন পারবে না, কিছু দক্ষিণা দিতে হবে অবশ্য।"

"কাকে দিতে হবে, টাকাটা কত?"

"যে তোমাকে গুঁড়িটা দেখাবে, সে তো আমি। কত দিতে হবে সে অবশ্য আলাদা কথা।"

দু'জনে তো দরাদরি শুরু করল তখন। কৃষকের বেশি টাকা নেই শুনে, বুড়ো যতবার টাকা দ্বিগুণ হবে প্রতিবারে ১ রুবল ২০ কোপেক করে নিতে রাজি হল।

দু'জনে তখন ঢুকল গভীর জঙ্গলে। বুড়ো অনেক খুঁজেপেতে কৃষককে নিয়ে এল ঝোপের ভেতর এক শ্যাওলাধরা ফারগাছের গুঁড়ির সামনে। তারপর কৃষকের থলিটা নিয়ে

Scanned by CamScanner

ওঁজে দিল শেকড়গুলির ভেতর। তারপর তারা একশো পর্যন্ত গুনল। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজবার পর থলিটা বের করে কৃষককে ফিরিয়ে দিল বুড়ো।

কৃষক তো খুলল থলিটা। কী অবাক কাণ্ড, টাকাগুলো সত্যিই দ্বিগুণ হয়ে গেছে! কথামতো ১ রুবল আর ২০ কোপেক গুনে বের করে নিয়ে, সে বুড়োকে আবার রাখতে দিল ওটা।

আবার তারা একশো পর্যন্ত গুনল। আবার সেই বুড়ো খুঁজে বার করল থলিটা। আবারও ঘটল সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা, টাকাগুলো সব দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আবার সেই যুক্তিমতো বুড়োকে সে দিল ১ রুবল আর ২০ কোপেক।

তারপর তৃতীয়বার তারা থলিটাকে লুকিয়ে রাখল। এবারও টাকাটা দ্বিগুণ হল। কিন্তু বুড়োকে তার ১ রুবল ২০ কোপেক দেবার পর এবার আর কিছুই থাকল না থলিতে। এভাবে সব টাকা হারাল গরিব লোকটা। দ্বিগুণ করে নেবার মতো আর টাকা যখন রইল না, মাথা হেঁট করে চলে গেল সে।

রহস্যটা অবশ্য বুঝতে পারছ সবাই। বুড়ো তো আর থলিটা খুঁজে বের করতে শুধু শুধু দেরি করেনি। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করব আর-একটা প্রশ্ন। বলো তো কৃষকের কাছে প্রথমে কত ছিল?"

১০. ডিসেম্বরের ধাঁধা

পরের জন শুরু করল, " শোনো ভাই তোমরা। আমি অঙ্কটঙ্ক জানি না। আমি হচ্ছি ভাষাতত্ত্বের লোক। আমার কাছে অঙ্কের ধাঁধা শুনতে চেয়ো না কিন্তু। আমি জিজ্ঞেস করব আর-এক ধরনের প্রশ্ন। আমার কাজকর্মের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। এটা হল ক্যালেন্ডারের ব্যাপার।"

"বলো, বলো।"

"ডিসেম্বর হল বছরের বারো নম্বরের মাস। ঐ নামটার আসল অর্থ কী জানো? কথাটা এসেছে গ্রিক ' ডেকা' শব্দ থেকে, যার অর্থ হল দশ। যেমন ' ডেকালিটার' শব্দের অর্থ দশ লিটার, 'ডিকেড' মানে হল দশ বছর, এইরকম। তা হলে ডিসেম্বরেরও হওয়া উচিত দশ নম্বরের মাস। কিন্তু তা তো নয়। কেন, তা বলতে পার বুঝিয়ে?"

১১. অঙ্কের খেলা

"আমি তোমাদের দেখাব একটা অঙ্কের ম্যাজিক, তোমাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে এটা। তোমাদের মধ্যে একজন–আচ্ছা প্রফেসর, আপনিই একটা তিন-সংখ্যাওয়ালা অঙ্ক লিখুন না। কী লিখলেন তা কিন্তু বলবেন না আমাকে।"

"অঙ্কটার ভেতর শূন্য দেওয়া চলবে তো?"

Scanned by CamScanner

" কোনো আপত্তি নেই। তিন-সংখ্যার যে- কোনো অঙ্ক লিখতে পারেন।"

" বেশ, এই লিখলাম। এরপর কী করতে হবে?"

"ঐ সংখ্যাকেই আবার আপনার সংখ্যাটার পাশে বসান। তা হলে এবার একটা ছয়-সংখ্যার অঙ্ক পেলেন।"

"ঠিক।"

"এবার কাগজটা আপনার পাশের ছেলেটিকে দিয়ে দিন। তা হলে ওটা আমার কাছ থেকে আরও দূরে চলে গেল। এবার ওকে ছয়-সংখ্যার অঙ্কটাকে সাত দিয়ে ভাগ করতে বলুন।"

"খুব তো বলছেন; যদি ভাগ না করা যায়?"

"যাবে যাবে, ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন?"

"সংখ্যাটা না জেনেই এত নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলছেন কী করে?"

"ভাগটা তো করে ফ্যালো, তারপর কথা বলো।"

"ঠিক বলেছ, ভাগ মিলে গেছে।"

"এখন অঙ্কের ফলটা পাশের ছেলেটাকে পৌঁছে দাও। আমাকে বোলো না কিন্তু। ও এটাকে ভাগ করুক ১১ দিয়ে।"

"ভাবছ, এবারও আগের মতোই হবে?"

"আরে অঙ্কটা তো করো। দেখো, কোনো ভাগশেষই থাকবে না।"

"এবারও ঠিকই বলেছ। এরপর?"

"উত্তরটাকে আবার চালান করে দাও, এবার এটাকে ভাগ করা হোক ... ধরো ১৩ দিয়ে।"

" তোমার পছন্দটা ভালো হল না। খুব কম সংখ্যাই আছে যাকে ১৩ দিয়ে ভাগ করা চলে।...না, কপাল ভালো তোমার, এটা তো মিলে গেছে!"

"এখন কাগজটা দাও আমাকে; হ্যাঁ, ভাঁজ করেই দাও যাতে দেখতে না পাই আমি।"

কাগজটাকে না খুলেই ছেলেটি এটা দিল অধ্যাপকের হাতে।

"এই তো আপনার সেই সংখ্যাটা, ঠিক বলিনি?"

"একেবারে ঠিক," আশ্চর্য হয়ে গেলেন অধ্যাপক," এই সংখ্যাটাই তো লিখেছিলাম আমি...সব্বাইয়ের পালাই শেষ হয়েছে, তো, আর বৃষ্টিও থেমেছে। চলো তবে বেরিয়ে পড়া যাক। রাত্রিবেলাতেই খাবার পর সব উত্তর জানা যাবে। তোমাদের সকলের উত্তর-লেখা কাগজের টুকরোগুলো আমাকে জমা দিতে পার।"

Scanned by CamScanner

১-১১ নম্বর ধাঁধার উত্তর

১. কাঠবিড়ালীর ধাঁধাটা আগেই সমাধান হয়েছে, সুতরাং পরের প্রশ্নগুলোর জবাব দিচ্ছি।

২. প্রথম প্রশ্নটার উত্তর খুব সহজেই দেওয়া যায় : প্রথম তিন মাসে পাঁচটি চক্র মোট কতবার একই দিনে বৈঠক করেছিল (১ জানুয়ারি বাদে) এটা বের করা যেতে পারে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬-এর ল.সা.গু. বার করলে। এটা তো কঠিন কিছু নয়। ল.সা.গু. হল ৬০। তা হলে পাঁচটি চক্রেরই আবার একসঙ্গে বৈঠক হবে ৬১তম দিনে–ফিটারের কাজ শেখার চক্রের অধিবেশন হল তিরিশের দ্বিগুণ দিনের ব্যবধানে, কাঠের কাজ শেখার চক্রের বৈঠক বসল ২০টা তিন-দিনের ব্যবধানে, ফোটোগ্রাফি শেখার চক্রের ১৫টা চার-দিন অন্তর, দাবা খেলোয়াড়রা ১২টা পাঁচ-দিন পরপর আর সমবেত সঙ্গীত শেখার চক্রের প্রতি ছ'-দিনের দিন ১০ বার। তার মানে হল, কেবল ৬০ দিনের মাথায় তারা সবাই একই দিনে বসতে পারছে। আর, প্রথম তিন মাসে আছে ৯০ দিন, তা হলে তারা সবাই প্রথমবার ছাড়া আর একবারই মাত্র একসঙ্গে মিলতে পারছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা এর চেয়ে একটু বেশি কঠিন : প্রথম তিন মাসে মোট কতদিন কোনো দলেরই কোনোই বৈঠক হয়নি? এটা বের করতে হলে ১ থেকে ৯০ পর্যন্ত সবকটি সংখ্যা লিখতে হবে, তা থেকে ফিটারের কাজ শেখার চক্রের অধিবেশনের দিনগুলো কেটে বাদ দাও, যেমন ১, ৩, ৫, ৭, ৯ .... এইরকম। তারপর বাদ দাও কাঠের কাজ শেখার চক্রের বৈঠকের দিনগুলি : যেমন ৪, ১০ ইত্যাদি। ফোটোগ্রাফি শেখার চক্র, দাবা খেলোয়াড়, সমবেত সঙ্গীত শেখার চক্রের মেলবার দিনগুলিও যখন বাদ দেওয়া হয়ে যাবে, তখন বাকি দিনগুলোই হবে সেই দিন যাতে কোনো দলেরই বৈঠক হবে না।

এটা করলেই দেখতে পাবে জানুয়ারিতে আট দিন, যেমন, ২, ৮, ১২, ১৪, ১৮, ২০, ২৪ আর ৩০ ফেব্রুয়ারিতে সাত দিন আর মার্চে নয় দিন, মোট হবে ২৪ দিন।

৩. তারা দু'জনেই সমান সংখ্যার পথিকদের গুনতি করেছিল। দরজায় যে দাঁড়িয়েছিল সে গুনেছিল যারা আসা-যাওয়া করছিল তাদের। যে পায়চারি করছিল সে রাস্তা দিয়ে যাদের আসতে দেখেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল যাদের যেতে দেখেছিল তাদের দ্বিগুণ।

৪. প্রথমে মনে হতে পারে যে ধাঁধাটা বলতে হয়তো ভুল হয়েছে–নাতি আর ঠাকুর্দা দু'জনের বয়সই সমান! শিগ্‌গিরই দেখতে পাবে কিছু ভুল নেই ধাঁধাটায়।

এটা তো পরিষ্কার যে নাতির জন্ম হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। তাই, তার জন্মসালের প্রথম দুটো সংখ্যা হল ১৯ (শতকের ঘরের সংখ্যা)। অন্য দুটো সংখ্যাকে দ্বিগুণ করলে হয় ৩২। তা হলে সংখ্যাটা হল ১৬। নাতির জন্ম হয়েছিল ১৯১৬ সালে আর ১৯৩২ সালে তার বয়স হল ১৬ বছর।

তা হলে ঠাকুর্দা নিশ্চয়ই জন্মেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সেইজন্য তাঁর জন্মসালের প্রথম দুটো সংখ্যা হল ১৮। বাকি সংখ্যা দুটোকে দ্বিগুণ করলে হবে ১৩২-এর সমান। তা হলে আমাদের সংখ্যাটা হল ১৩২-এর অর্ধেক, অর্থাৎ ৬৬।

Scanned by CamScanner

ঠাকুর্দা জন্মেছিলেন ১৮৬৬ সালে, আর ১৯৩২ সালে তাঁর বয়স দাঁড়াল ৬৬ বছর। তা হলেই ১৯৩২ সালে নাতি আর ঠাকুর্দা দুজনের বয়সই তাদের জন্মসালের শেষ দুটো সংখ্যার সমান ছিল।

৫. ২৫টা স্টেশনের প্রতিটা থেকেই যাত্রীরা বাকি ২৪টা স্টেশনের যে-কোনোটার টিকিট কিনতে পারে। তা হলে যত বিভিন্ন ধরনের টিকিট দরকার হয় তাদের সংখ্যা হল $২৫ \times ২৪ = ৬০০$।

আর যাত্রীরা যদি ফিরতি-টিকিটও কাটে (অর্থাৎ দু'দিকেরই) তা হলে টিকিটের ধরনের সংখ্যা হবে ২×৬০০, অর্থাৎ ১২০০।

৬. কিছু গোলমেলে কথা নেই এ ধাঁধাটায়। হেলিকপ্টারটা তো আর একটা বর্গক্ষেত্রের সীমানা ধরে উড়ে যায়নি! এটা খেয়াল করতে হবে যে পৃথিবীটা হল গোল আর দ্রাঘিমা রেখাগুলো সব মেরুতে গিয়ে একসঙ্গে মিশে যায় (১ নং ছবি)। তা হলে লেনিনগ্রাদের অক্ষাংশের ৫০০ কিলোমিটার উত্তরের অক্ষাংশ-বরাবর পূর্বদিকে যাবার সময় হেলিকপ্টারটাকে যত পথ পার হতে হয়েছে তা লেনিনগ্রাদের অক্ষাংশ ধরে ফিরে আসবার পথের চেয়ে কম। ফলে লেনিনগ্রাদের পূর্বদিকেই হেলিকপ্টারের পাল্লা শেষ হয়েছিল।

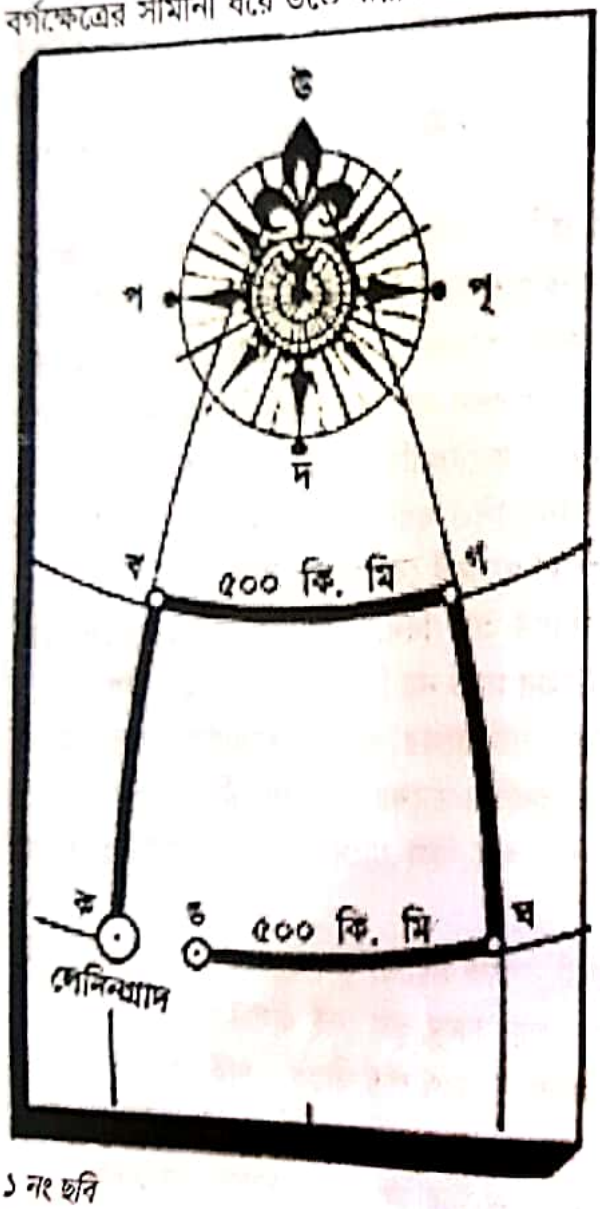

১ নং ছবি

কথা হচ্ছে, কত কিলোমিটার দূরে? সে তো হিসেব কষেই বের করা যায়। ১ নং ছবিতে হেলিকপ্টারের পথটা ক খ গ ঘ ঙ দিয়ে দেখানো হয়েছে। উ হল উত্তর মেরু, এখানে ক খ আর ঘ গ দ্রাঘিমা এসে মিশছে। হেলিকপ্টারটা প্রথমে গিয়েছিল ৫০০ কিলোমিটার উত্তরে তার মানে ক উ দ্রাঘিমা ধরে এগিয়েছিল। এখন দ্রাঘিমার ওপরে প্রতি ডিগ্রিতে হয় ১১১ কিলোমিটার; তা হলে ৫০০ কিলোমিটার লম্বা বৃত্তচাপে হবে $৫০০ : ১১১ \approx ৪°৩০'$। লেনিনগ্রাদ হল ৬০ অক্ষাংশে। তা হলে খ-র অক্ষাংশ দাঁড়াচ্ছে $৬০° +$

Scanned by CamScanner

৪°৩০′ = ৬৪°৩০′। হেলিকপ্টারটা এরপর উড়ে গিয়েছিল পূর্বদিকে, তার মানে খ গ অক্ষাংশ ধরে ৫০০ কিলোমিটার এগিয়েছিল। এই অক্ষাংশ (৬৪°৩০′) প্রতি ডিগ্রির (দ্রাঘিমার) দূরত্ব হিসেব করে বের করা যায় (তৈরি-করা ছক থেকেও পাওয়া যেতে পারে)–এটা হল ৪৮ কিলোমিটারের সমান। এখন পূর্বদিকে হেলিকপ্টারটাকে মোট কত ডিগ্রি পথ পেরোতে হয়েছিল তার হিসেবটা সোজা হয়ে যাচ্ছে–৫০০ : ৪৮ ≈ ১০°২৪′। এরপর হেলিকপ্টারটা এগোল দক্ষিণে, অর্থাৎ গ ঘ দ্রাঘিমা ধরে। এভাবে ৫০০ কিলোমিটার পার হবার পর এসে পৌছল লেনিনগ্রাদের অক্ষাংশে–আর সেখান থেকেই আবার তার গতি হল পশ্চিমদিকে ঘ ক-বরাবর। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এখানে ৫০০ কিলোমিটার পথ ক আর ঘ-র দূরত্বের চেয়ে ছোট। এখন ক ঘ আর খ গ দু'জায়গাতেই ডিগ্রির (দ্রাঘিমার) পরিমাণ সমান, অর্থাৎ ১০°২৪′। ৬০° অক্ষাংশে ১° (দ্রাঘিমার) দৈর্ঘ্য হল প্রায় ৫৫.৫ কিলোমিটার। তা হলে ক থেকে ঘ-র দূরত্ব হল ৫৫.৫ × ১০°২৪′ ≈ ৫৭৭ কিলোমিটারের সমান। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে হেলিকপ্টারটা লেনিনগ্রাদের কাছাকাছিও নামতে পারেনি, নেমেছিল ৭৭ কিলোমিটার দূরে (পূর্বে)।

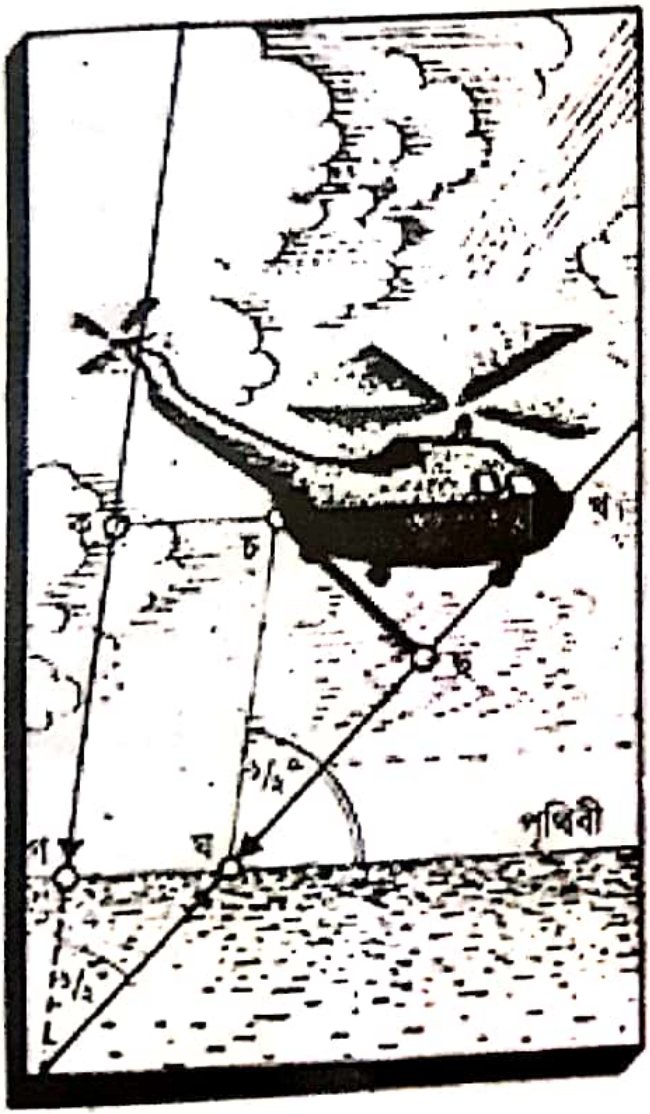

২ নং ছবি

৭. এই ধাঁধাটা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের গল্পের সবাই অনেক ভুল করেছিল। সূর্যের রশ্মি পাখার মতোই ছড়িয়ে পড়ে–কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। দূরত্বের

তুলনায় পৃথিবী সূর্য থেকে এত ছোট যে সূর্যের রশ্মি পৃথিবীর যেখানেই পড়ুক না কেন একটার সঙ্গে আর একটা যে একটু কোণাকুণিভাবে আছে তা প্রায় ধরাই যায় না। সত্যি বলতে কি রশ্মিগুলিকে একরকম সমান্তরালই বলা চলে। আমরা অবশ্য অনেক সময় রশ্মিকে পাখার মতোই ছড়িয়ে পড়তে দেখি। এগুলো অবশ্য পরিপ্রেক্ষণের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

Scanned by CamScanner

কোনো বিন্দু থেকে দুটো সমান্তরাল রেখাকে বাড়িয়ে গেলে মনে হবে যেন অনেক দূরের একটা বিন্দুতে মিশে যাচ্ছে তারা, যেমন রেলওয়ের লাইন, বা দু'ধারে গাছের সারি দেওয়া লম্বা পথ।

কিন্তু সূর্যের কিরণ মাটিতে সমান্তরাল হয়ে পড়ে মানেই এ নয় যে হেলিকপ্টারের নিখুঁত ছায়াটাও হেলিকপ্টারটার সমানই লম্বা হবে। ২নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে হেলিকপ্টারের নিখুঁত ছায়াটা শূন্যের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর ওপরে পৌঁছবার পথে ছোট হয়ে আসে। ফলে হেলিকপ্টারের যে-ছায়াটা পড়ে তা তার নিজের চাইতে ছোট—গ ঘ যেমন ক খ-র চাইতে ছোট হয়েছে।

দৈর্ঘ্যের এই তফাতটা কিন্তু হিসেব করে বের করে ফেলা যায়। অবশ্য তা করতে হলে হেলিকপ্টারটা কত উঁচুতে উড়ছে সেটা জানতে হবে। ধরে নেওয়া যাক ওটা উড়ছে ১০০ মিটার ওপরে। এখন ক গ আর খ ঘ রেখার ভেতরে যে-কোণটা তৈরি হয়েছে সেটা পৃথিবী থেকে যতটা কোণের ভেতর সূর্যকে দেখা যায় তারই সমান। আমরা জানি সেটা হল $\frac{১^\circ}{২}$-র সমান। আবার এটাও জানা আছে যে, যে-জিনিসটাকে $\frac{১^\circ}{২}$ কোণের ভেতরে দেখা যায়, যে দেখছে তার থেকে সেটার দূরত্ব হয় সেই জিনিসটার ব্যাসের ১১৫ গুণ।

তা হলে, চ ছ অংশটা (যা পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে $\frac{১^\circ}{২}$ কোণে দেখা যায়) হল ক গ-র $\frac{১}{১১৫}$ অংশ। ক থেকে সোজাসুজি পৃথিবীর দূরত্ব যতটা (লম্বা দূরত্ব) ক গ রেখা তার চেয়ে লম্বায় বড়। এখন, সূর্যের কিরণ পৃথিবীর মাটিতে যদি ৪৫° কোণাকুণিভাবে পড়ে তা হলে ক গ (হেলিকপ্টারের উচ্চতা ১০০ মিটার, তা তো দেওয়াই আছে) হল প্রায় ১৪০ মিটার লম্বা। কাজেকাজেই চ ছ অংশটা হল ১৪০ : ১১৫ = ১.২ মিটারের সমান।

তা হলেই, হেলিকপ্টার আর ছায়ার ভেতরে তফাতটা—অর্থাৎ চ খ চ ছ-এর চাইতে বড় (ঠিক ঠিক বলতে গেলে ১.৪ গুণ) কারণ চ খ ঘ কোণ প্রায় ৪৫°-র সমান। এইভাবে চ খ হল ১.২ × ১.৪-এর সমান, অর্থাৎ প্রায় ১.৭ মিটার।

এ সমস্ত হিসেব কিন্তু পরিষ্কার, কালো আর নিখুঁত ছায়ার বেলায়ই খাটবে; অস্পষ্ট, ঝাপসা প্রচ্ছয়ার বেলায় খাটবে না।

এই হিসেবের ফাঁকে কিন্তু আরও একটা জিনিস পাওয়া গেল : হেলিকপ্টারের বদলে যদি ১.৭ মিটার ব্যাসওয়ালা একটা বেলুন থাকত, তা হলে নিখুঁত কোনো ছায়া পাওয়া যেত না। আমরা শুধু একটা ঝাপসা প্রচ্ছায়া দেখতে পেতাম।

৮. এ-ধাঁধাটার সমাধান করতে হলে উলটো দিক থেকে শুরু করতে হবে। দেশলাই কাঠিগুলিকে শেষবারের মতো চালান করে দেবার পর সবকটা ভাগেই কাঠির সংখ্যা সমান হয়েছিল—এইখান থেকেই আমাদের হিসেব শুরু করতে হবে। এখন এই

Scanned by CamScanner

সাজানোর সময় দেশলাই কাঠির মোট সংখ্যা (৪৮) তো আর পরিবর্তন হয়নি তাই প্রতিভাগে মোট ১৬টা করেই কাঠি ছিল।

তা হলে, সবশেষে আমরা যা পেয়েছিলাম, তা হল :

প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ	তৃতীয় ভাগ
১৬	১৬	১৬

ঠিক এর আগেই প্রথম ভাগের সঙ্গে আমরা সমানসংখ্যার কাঠি যোগ করেছিলাম। তার মানেই হল প্রথম ভাগে কাঠি এনে নিখুঁতভাবে দেবার পর সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়েছে তা হলে শেষবারের মতো সাজিয়ে রাখার আগে প্রথম ভাগে ছিল মাত্র ৮টা কাঠি। আর তৃতীয় ভাগে, যেখান থেকে এই ৮টা কাঠি নিয়েছিলাম সেখানে ছিল : ১৬+৮=২৪।

এখন তা হলে ভাগগুলোর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে :

প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ	তৃতীয় ভাগ
৮	১৬	২৪

এরপর আবার আমরা জানি যে তৃতীয় ভাগে যত কাঠি ছিল দ্বিতীয় ভাগ থেকে সেই সংখ্যার কাঠি নিয়েছিলাম আমরা। তার মানে হল আগের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে ২৪ হয়েছে। তা হলে প্রথম বার সাজানোর পর আমাদের ভাগগুলোতে কতগুলি করে কাঠি ছিল তা পাওয়া যাচ্ছে :

প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ	তৃতীয় ভাগ
৮	১৬ + ১২ = ২৮	১২

এখন তো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, প্রথম বার সাজানোর আগে (অর্থাৎ প্রথম থাক থেকে দ্বিতীয় থাকের সমান সংখ্যার কাঠি নিয়ে তাতে যোগ করার আগে) প্রতি থাকে দেশলাই কাঠির যে-সংখ্যাটা ছিল, তা হল :

প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ	তৃতীয় ভাগ
২২	১৪	১২

৯. এ-ধাঁধাটাকেও উলটো দিক থেকে সমাধান করা সহজ হবে। ব্যাপার হল, যখন টাকাটাকে তৃতীয় বারের মতো দ্বিগুণ করা হল, তখন থলেটায় ছিল ১ রুবল ২০ কোপেক (শেষবারে এই টাকাটা পেয়েছিল বুড়ো)। এর আগে তা হলে থলেটায় কত ছিল? ছিল ৬০ কোপেক। এই টাকাটাই তা হলে বুড়োকে দ্বিতীয় বারের রুবল আর ২০ কোপেক মিটিয়ে দেবার পর ছিল কৃষকের কাছে। তা হলে টাকাটা দেবার আগে ছিল : ১.২০ + ০.৬০ = ১.৮০।

আবার : ১ রুবল ৮০ কোপেক দাঁড়িয়েছিল টাকাটাকে দ্বিতীয় বার দ্বিগুণ করার পর। তার আগে ছিল ৯০ কোপেক মাত্র। তার মানে বুড়োকে প্রথম বারের রুবল আর ২০ কোপেক মিটিয়ে দেবার পর এই টাকাটাই অবশিষ্ট ছিল। তা হলে, প্রথম বারে টাকা দেবার আগে থলেটায় ছিল ০.৯০ + ১.২০ = ২.১০। আর এটা হল প্রথম বারে দ্বিগুণ করার পর। সবচেয়ে প্রথমে তা হলে ছিল এরও অর্ধেক অথবা ১ রুবল ৫ কোপেক। এই টাকাটা নিয়েই কৃষক তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার নিষ্ফল কারবারে নেমেছিল।

Scanned by CamScanner

উত্তরটাকে একটু মিলিয়ে দেখা যাক :

থলের ভেতর যে টাকাটা ছিল :

প্রথম	বার	দ্বিগুণ	করার	পর	.....	১.০৫ × ২	= ২.১০
প্রথম	বার	টাকা	মেটাবার	পর	.....	২.১০−১.২০	= ০.৯০
দ্বিতীয়	বার	দ্বিগুণ	করার	পর	.....	০.৯০ × ২	= ১.৮০
দ্বিতীয়	বার	টাকা	মেটাবার	পর	.....	১.৮০−১.২০	= ০.৬০
তৃতীয়	বার	দ্বিগুণ	করার	পর	.....	০.৬০ × ২	= ১.২০
তৃতীয়	বার	টাকা	মেটাবার	পর	.....	১.২০−১.২০	= ০

১০. আমাদের ক্যালেন্ডার এসেছে পুরনো রোমানদের কাছ থেকে। তাঁরা জুলিয়াস সিজারের আগে পর্যন্ত বছর শুরু করতেন মার্চ মাস থেকে। তখন ডিসেম্বর ছিল দশম মাস। যখন নববর্ষ ১ জানুয়ারি থেকে শুরু করা হল মাসের নামগুলোকে কিন্তু আর পরিবর্তন করা হল না। এইজন্যই কোনো মাসের সংখ্যা আর তাদের নামের অর্থে অমিল রয়ে গেছে।

মাস	অর্থ	অবস্থান
সেপ্টেম্বর	সেপ্টেম = সাত	৯ম
অক্টোবর	অক্টো = আট	১০ম
নভেম্বর	নভেম = নয়	১১শ
ডিসেম্বর	ডেকা = দশ	১২শ

১১. প্রথম সংখ্যাটা থেকে কী দাঁড়াল দেখা যাক। শুরুতে সংখ্যাটার পাশে ঠিক ঐ সংখ্যাটাই লেখা হল। তার মানেই হল সংখ্যাটাকে ১০০০ দিয়ে গুণ করে তার সঙ্গে প্রথম সংখ্যাটা যোগ করলে যা হয় তা-ই, যেমন :

৮,৭২,৮৭২ = ৮,৭২,০০০ + ৮৭২

তা হলে এটা পরিষ্কার হল যে আমরা আসলে প্রথম সংখ্যাটাকে ১০০১ দিয়ে গুণ করেছি। তারপর এটাকে পরপর ৭, ১১ আর ১৩ দিয়ে ভাগ করেছি, অথবা ৭ × ১১ × ১৩, অর্থাৎ ১০০১ দিয়ে ভাগ করেছি–তা-ই না?

তা হলে, আমরা প্রথমে সংখ্যাটাকে ১০০১ দিয়ে গুণ করেছি, পরে সেটাকে ১০০১ দিয়ে ভাগ করেছি। জলবৎ তরলং নয় কি?

* * *

১২. হারানো সংখ্যা

তোমার বন্ধুদের কয়েকটা অঙ্কওয়ালা একটা সংখ্যা লিখতে বলো। কিন্তু শেষের অঙ্ক শূন্য হলে চলবে না। ধরো সংখ্যাটা হল ৮৪৭। তাকে সংখ্যার তিনটে অঙ্ককে পাশাপাশি যোগ করে সংখ্যাটা থেকে বিয়োগ দিতে বলো। তা হলে ফলটা দাঁড়াবে :

৮৪৭−১৯ = ৮২৮

Scanned by CamScanner

এই সংখ্যা থেকে যে-কোনো একটি বাদ দিয়ে বাকি দুটো তাকে বলতে বলো। এখন যদিও তোমার আসল অঙ্কটা বা সংখ্যাটার কিছুই জানা নেই তবু তাকে অঙ্কটা বলে দিতে পারবে।

এটা কী করে ব্যাখ্যা করা যায় বলো তো?

ব্যাপারটা খুবই সহজ। তোমাকে যেটা করতে হবে তা হল : তোমার জানা দুটো অঙ্কের সঙ্গে এমন একটা অঙ্ক যোগ করতে হবে, যার সবচেয়ে কাছের সংখ্যাটা ৯ দিয়ে ভাগ দিলে মিলে যায়। উদাহরণ দিচ্ছি : যদি ৮২৮-এর ভেতর সে-প্রথম অঙ্ক (৮) বাদ দিয়ে, অন্য দুটো অঙ্ক (২ আর ৮) তোমাকে বলে, তা হলে তুমি সে দুটোকে যোগ করে পেলে ১০। ১০-এর পর সবচেয়ে প্রথমে যে-সংখ্যাটা ৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় তা হল ১৮। তা হলে সেই হারানো সংখ্যাটা হল ৮।

সেটা আবার কী করে হয়? সংখ্যাটা যা-ই হোক-না কেন, তা থেকে অঙ্কগুলোর যোগফল বিয়োগ করলে ফলটা সবসময়ই ৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে। আচ্ছা, শতকের ঘরের অঙ্কটাকে ধরি প, দশকের ঘরে ধরলাম ফ, আর ব ধরলাম এককের কোঠায়। তা হলে এগুলো দিয়ে পুরো সংখ্যাটা হল :

$$১০০প + ১০ফ + ব$$

এই সংখ্যা থেকে অঙ্কগুলোর মোট যোগফল প + ফ + ব বিয়োগ দিলে আমরা পাচ্ছি :

$$১০০প + ১০ফ + ব - (প + ফ + ব) = ৯৯প + ৯ফ = ৯ (১১প + ফ)$$

কিন্তু ৯ (১১প + ফ)-কে ৯ দিয়ে ভাগ করলে নিশ্চয়ই মিলে যাবে। তা হলে, কোনো সংখ্যা থেকে তার অঙ্কগুলোর যোগফল বিয়োগ করলে ফলটা সবসময়ই ৯ দিয়ে বিভাজ্য হবে।

এমন হতে পারে, যে-দুটো অঙ্ক বলে দেবে তাদের যোগফলই ৯ দিয়ে ভাগ করা যায় (যেমন ৪ আর ৫)। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে-অঙ্কটা তোমার বন্ধু বাদ দিয়েছে তা হয় ০ অথবা ৯। সেসব জায়গায় তোমাকে বলতে হবে যে, লুপ্ত সংখ্যাটা হল ০ অথবা ৯।

এই খেলাটাই অন্য আর একভাবে খেলা চলে : আসল সংখ্যা থেকে অঙ্কগুলোর যোগফল বিয়োগ দেওয়ার বদলে তোমার বন্ধুকে ঐ অঙ্কগুলোকেই ইচ্ছেমতো অন্যভাবে সাজিয়ে বিয়োগ দিতে বলো। একটা উদাহরণ ধরা যাক। যদি সে সংখ্যাটা লেখে ৮২৪৭, তা হলে ২৭৪৮ বিয়োগ করতে পারে (নতুন করে সাজিয়ে সংখ্যাটা যদি প্রথম সংখ্যাটা থেকে বড় হয়ে যায় তবে প্রথমটাকেই বিয়োগ দাও)। বাকিটা আগের মতোই করতে হবে : ৮২৪৭ - ২৭৪৮ = ৫৪৯৯। এ থেকে বাদ-দেওয়া অঙ্কটা যদি হয় ৪, তবে অন্য অঙ্ক তিনটে জেনে নিয়ে যোগ দিলে পাওয়া যাবে ২৩। এর সবচেয়ে কাছাকাছি যে-সংখ্যাটা ৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় তা হল ২৭। তা হলে লুপ্ত অঙ্কটা হল ২৭-২৩ = ৪।

Scanned by CamScanner

১৩. কার কাছে আছে?

এই বুদ্ধির খেলায় পকেটে রাখা চলে এমন তিনটে জিনিস দরকার। একটা পেন্সিল, একটা চাবি, আর একটা কলম-কাটা ছুরিতেই তা বেশ চলতে পারে। এসব বাদে, একটা প্লেটে ২৪টা বাদাম টেবিলের ওপর রেখে দাও। দাবা বা পাশার ঘুঁটি অথবা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়েও কাজটি বেশ চলতে পারে।

এই সমস্ত যোগাড়যন্তর শেষ করে, তোমার তিন বন্ধুর প্রত্যেককে বলো ঐ তিনটে জিনিস থেকে একটা করে নিয়ে পকেটে রাখতে। একজন নেবে পেন্সিল, দ্বিতীয় জন চাবি আর তৃতীয় জন কলম-কাটা ছুরি। ওরা এসব করার সময় তুমি কিন্তু সেখানে থাকবে না। তারপর ঘরে ফিরে এসে তুমি ঠিকঠিক বুঝে ফ্যালো কোনটা কার কাছে আছে।

এই বুঝে ফেলার নিয়মটা বলি এবার : তুমি ফিরে আসবার পর (অর্থাৎ সকলে যখন জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলেছে) ওদের কাছে কিছু বাদাম রাখতে দাও—প্রথম বন্ধুকে দাও একটা, দ্বিতীয় জনকে দুটো আর তৃতীয়কে তিনটে। তারপর ওদের এইভাবে আরও কিছু বাদাম নিতে বলে আবার সে-ঘর ছেড়ে চলে যাও—যে পেন্সিল নিয়েছে তাকে নিতে হবে সে যতটা পেয়েছিল ঠিক ততটা, যে চাবি নিয়েছে সে নেবে তাকে যতটা বাদাম দেওয়া হয়েছিল তার দ্বিগুণ, আর যে কলম-কাটা ছুরি নিয়েছিল তাকে নিতে হবে সে যতটা পেয়েছিল তার চারগুণ।

বাকিগুলো প্লেটেই থাকবে।

ঐভাবে নেওয়া হয়ে গেলে ওরা ভেতরে ডাকবে তোমাকে। তুমিও ভেতরে ঢুকে প্লেটটার দিকে একবার তাকিয়েই কোন বন্ধুর পকেটে কী রয়েছে বলে দেবে।

এটা আরও তাজ্জব খেলা, কারণ খেলাটা তুমি দেখাচ্ছ একেবারে একা, এমনকি কোনো সহকারীও নেই, যে চুপেচুপে ইশারা করতে পারে তোমাকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এ-ধাঁধাটায় কোনো কায়দা-টায়দা নেই, সমস্তটাই হল হিসেবের ব্যাপার। প্লেটটায় কটা বাদাম আছে এটা দেখেই বুঝে নিতে হবে তোমাকে, কে কোনটা নিয়েছে। সাধারণত একটা থেকে সাতটা পর্যন্ত বাদাম পড়ে থাকে, এর বেশি বড় একটা থাকে না—আর এ-কটা তো একনজরেই গুনে ফেলতে পারবে। তা হলে কার কাছে কী আছে সেটা কীভাবে জানা যাবে?

ব্যাপারটা খুবই সোজা। তিনটে জিনিসকে যত ভিন্ন ভিন্নভাবে রাখা যায়, তার প্রত্যেকটাতেই প্লেটের ওপর ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার বাদাম পড়ে থাকে। ব্যাপারটা কীভাবে হয় দেখাচ্ছি।

তোমার তিনজন বন্ধুর নাম ধরো দামু, দেবু আর ফেলু অথবা ছোট্ট করে বলা যায়, 'দা', 'দে' আর 'ফে'। তিনটে জিনিসকে নাম দেওয়া হল এভাবে : পেন্সিলটা 'পে', চাবিটা 'চা' আর ছুরিটা 'ছু'। তিনটে জিনিস তিন বন্ধুর ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া যায় মোটামুটি ছয়ভাবে :

Scanned by CamScanner

দা	দে	ফে
পে	চা	ছু
পে	ছু	চা
চা	পে	ছু
চা	ছু	পে
ছু	পে	চা
ছু	চা	পে

ওপরের ছকে মোট যে-কয়টা ভাগ হওয়া সম্ভব তা দেখানো হয়েছে—এ ছাড়া আর কোনোভাবেই ভাগ হওয়া সম্ভব নয়।

এবার তা হলে দেখা যাক, এক-এক ধরনে ভাগ করলে প্রতিবারে কটা করে বাদাম পড়ে থাকে।

দেখতে পাচ্ছ, সব বারেই আলাদা আলাদা-সংখ্যক বাদাম পড়ে থাকছে। তা হলে, কত বাকি আছে দেখেই তুমি সহজে ঠিক করতে পারবে কার পকেটে কী আছে। তৃতীয় বারে আবার ঘর থেকে বের হবে, তোমার নোটবইটা দেখবে :

দা	দে	ফে	যে-কটা বাদাম তারা নিয়েছে	মোট	কটা বাকি থাকে
পে	চা	ছু	১ + ১ = ২ ; ২ + ৪ = ৬; ৩ + ১২ = ১৫	২৩	১
পে	ছু	চা	১ + ১ = ২ ; ২ + ৮ = ১০ ; ৩ + ৬ = ৯	২১	৩
চা	পে	ছু	১ + ২ = ৩ ; ২ + ২ = ৪ ; ৩ + ১২ = ১৫	২২	২
চা	ছু	পে	১ + ২ = ৩ ; ২ + ৮ = ১০ ; ৩ + ৩ = ৬	১৯	৫
ছ	পে	চা	১ + ৪ = ৫ ; ২ + ২ = ৪ ; ৩ + ৬ = ৯	১৮	৬
ছু	চা	পে	১ + ৪ = ৫ ; ২ + ৪ = ৬ ; ৩ + ৩ = ৬	১৭	৭

এর ভেতরে ওপরের ছকটা তুমি আগেই লিখে রেখেছ (সত্যি কথা বলতে কী, কেবল প্রথম আর শেষ সারিটাই তোমার দরকার হবে)। ছকটা মুখস্থ করে রাখা কঠিন।

কিন্তু সত্যি বলতে কী তার কোনো দরকারই নেই। ছকটাই জানিয়ে দেবে কোথায় কোন জিনিসটা আছে। উদাহরণ ধরা যাক, যদি প্লেটটায় পাঁচটা বাদাম পড়ে থাকে, তা হলে জিনিসগুলো ছড়িয়ে আছে—'চা' 'ছু' 'পে' এইভাবে। তার মানে দামুর কাছে চাবি, দেবুর কাছে ছুরি, আর ফেলু নিয়েছে পেন্সিল।

যদি ঠিকঠিক দেখাতে চাও, তা হলে তিন বন্ধুর কাকে কটা বাদাম দিয়েছিলে তা মনে রাখতেই হবে (এটা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল বর্ণমালার অক্ষর অনুসারে দিয়ে যাওয়া, আর এখানে তাই-ই করেছি আমরা)।

Scanned by CamScanner

১৪. দড়ি

খোকার মা ময়লা কাপড়চোপড় কাচা বন্ধ করে রেগে উঠলেন, "কী? আরও দড়ি চাই বুঝি? ভেবেছ আমি একেবারে দড়ির বান্ডিল নিয়ে বসে আছি! খালি শুনব দড়ি দাও। কালই তো পুরো একগাছি দড়ি দিয়েছি, কী কাজটা করা হল তা দিয়ে, কিসে যে এত লাগে তোমার?"

খোকাও অমনি জবাব দিলে, "কী আবার করেছি? অর্ধেক তো তুমিই ফিরিয়ে নিলে...."

"না হলে কাপড়চোপড়গুলো বাঁধব কোন মুণ্ডু দিয়ে শুনি?"

"বাকিটার অর্ধেক নিল টম। ও খালের জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরবে।"

"বেশ তো, তোমার বড় ভাইকে তুমি তো আর না বলতে পার না।"

"তা আমি করিনি। আর তো অল্পই ছিল, বাবা তা থেকে আবার অর্ধেক নিলেন গ্যালিস সারাবার জন্যে, মোটরগাড়ির ব্যাপার যখন ঘটে তখন হাসতে হাসতে ছিঁড়ে গেছিল ওটা। সবশেষে বিনুনি বাঁধতে খুকু বাকিটার পাঁচ ভাগের দু'ভাগ..."

"আর বাকিটা কী করলে?'

"বাকিটা? আর মাত্র ৩০ সেন্টিমিটারই ছিল, ওই দিয়ে বুঝি টেলিফোন তৈরি করা যায়?"

প্রথমে কতটা দড়ি ছিল?

১৫. মোজা আর দস্তানা

একটা বাক্সে ১০ জোড়া বাদামি মোজা আর ১০ জোড়া কালো মোজা আছে, আরেক বাক্সে আছে ঐ একই সংখ্যার বাদামি আর কালো দস্তানা। তা হলে একই রঙের একজোড়া মোজা আর দস্তানা পেতে হলে বাক্স থেকে কটা মোজা আর দস্তানা তুলতে হবে?

১৬. চুলের আয়ু

একজন মানুষের মাথায় গড়পড়তা কত চুল থাকে? প্রায় ১,৫০,০০০* । হিসেব করে দেখা গেছে মানুষের মাথা থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৩০০০০ করে চুল উঠে যায়।

আচ্ছা, এ থেকে মানুষের মাথার প্রতিটা চুলের গড়পড়তা আয়ু কত তা বলতে পার?

---

* অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে আমরা এই সংখ্যাটা পেলাম কী করে। আমাদের কি মাথার চুল গুনতে হয়েছে? তা নয়। মানুষের মাথার এক বর্গ সেন্টিমিটার স্থানের চুল গুনলেই যথেষ্ট। এই সংখ্যা এবং চুলে-ঢাকা খুলির পরিমাণ জেনে নিয়ে মোট হিসেবটা বের করা কঠিন নয়। বনজঙ্গলের গাছ গোনার জন্য বৃক্ষগণনাকারীরা যে-পদ্ধতি অনুসরণ করেন এ-ব্যাপারে সেই পদ্ধতিরই প্রয়োগ করা হয়।

Scanned by CamScanner

১৭. মাইনে

মাইনে ও ওভারটাইম মিলিয়ে গত মাসে আমার পাওনা হয়েছিল ১৩০ রুবল। ওভারটাইম বাদে আমার মূল মাইনে হল ওভারটাইমের চেয়ে ১০০ রুবল বেশি। ওভারটাইম বাদ দিয়ে আমার আয় কত?

১৮. স্কিইং

একজন লোক হিসেব কষে দেখল যদি সে ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার স্কি করে যায়, তা হলে একটা জায়গায় সে পৌছবে বেলা ১টায়, আর ১৫ কিলোমিটার হিসেবে গেলে সেখানে পৌছবে বেলা ১১টায়।

ঐ জায়গাতে বেলা ১২টায় পৌছতে হলে সে কত জোরে স্কি করবে?

১৯. দু'জন শ্রমিক

দু'জন শ্রমিক, একজন বুড়ো আর একজন জোয়ান, তারা একই ফ্ল্যাটে থাকে আর কাজও করে একই কারখানায়। কারখানায় পৌছতে জোয়ান শ্রমিকের লাগে ২০ মিনিট, বুড়ো পৌছয় ৩০ মিনিটে। যদি বুড়ো শ্রমিক পাঁচ মিনিট আগে রওনা হয়, তা হলে জোয়ান শ্রমিক তাকে কখন ধরে ফেলবে?

২০. টাইপ করা

দু'জন মেয়েকে একই ঘরে টাইপ করতে দেওয়া হল। এদের ভেতর যে বেশি অভিজ্ঞ সে কাজটা করে দু'ঘণ্টায়, অন্যজনের লাগে তিন ঘণ্টা। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে হলে তাদের কতটা সময় লাগবে?

এ-ধরনের সমস্যার সমাধান সাধারণত করা হয় এভাবে : বের করতে হবে এক ঘণ্টায় তারা কাজটার কতখানি অংশ শেষ করে, তারপর দুটোকে যোগ করে, যোগফল দিয়ে ১-কে ভাগ করে নিতে হয়। এ-ধাঁধাটাকে কোনো নতুনভাবে সমাধান করার উপায় বের করতে পার?

২১. দাঁতওয়ালা চাকা

২৪ দাঁতাওয়ালা একটি চাকার সঙ্গে ৮ দাঁতওয়ালা একটা চাকা জুড়ে দেওয়া হল (৩ নং ছবি)। বড় চাকাটা একবার ঘুরে আসতে ছোট চাকাটাকে নিজের ওপর কবার পাক খেতে হবে?

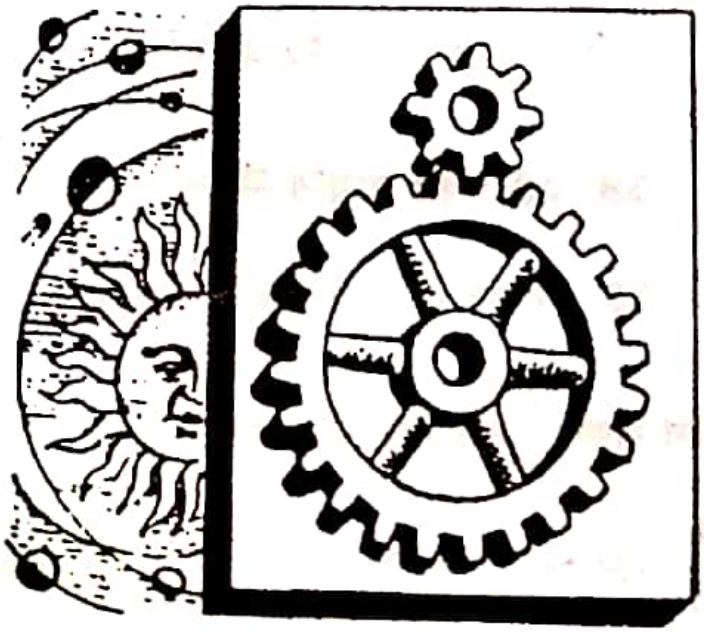

৩ নং ছবি। কবার ছোট চাকা পাক খাবে?

২২. বয়স কত?

এক উৎসাহী ধাঁধাবিশারদকে তার বয়স কত প্রশ্ন করা হয়েছিল উত্তরটায় উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় মেলে :

Scanned by CamScanner

"এখন থেকে ৩ বছর পর আমার যা বয়স হবে, তাকে ৩ গুণ করে তা থেকে আমার তিন বছর আগের বয়স তিন গুণ করে বিয়োগ করলেই আমার বয়স কত জানতে পারবে।"

তা হলে তার বয়সটা কত?

২৩. ইভানোভ পরিবার

সেদিন আমার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ইভানোভের বয়স কত হে?"

"ইভানোভ? আচ্ছা দেখছি। আঠারো বছর আগে তার বয়স ছিল তার ছেলের বয়সের তিন গুণ। আমার এটা ভালোই মনে আছে, কারণ সে-বছর লোক-গণনা হয়েছিল।"

"কিন্তু আমি যতদূর জানি, এখন তো তার বয়স ছেলের বয়সের দ্বিগুণ। এটা কি অন্য ছেলে?" আমার বন্ধু বলল বাধা দিয়ে।

"না, সেই ছেলেই, ওর একটাই ছেলে। আর তাই ওদের বয়স বের করা কঠিন নয়।"

আচ্ছা পাঠক, বলো তো ওদের বয়স?

২৪. কেনাকাটা

এক রুবলের নোট আর খুচরো ২০ কোপেকের মুদ্রাগুলো মিলিয়ে প্রায় ১৫ রুবল নিয়ে আমি বাজারে গেলাম। যখন ফিরলাম তখন আগে আমার কাছে যে-কয়টা রুবলের নোট ছিল ততটা ২০ কোপেকের মুদ্রা আছে। আর নোট আছে যতটা, ২০ কোপেকের মুদ্রা ছিল ততটা। বাজারে যত টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম ফিরলাম তার তিনভাগের একভাগ নিয়ে।

আমি কত টাকা খরচ করেছিলাম?

১৪–২৪ নম্বর ধাঁধার উত্তর

১৪. খোকার মা অর্ধেকটা দড়ি নিয়ে নেবার পর থাকল $\frac{১}{২}$। ভাই তার অর্ধেকটা নিয়ে নিলে থাকল $\frac{১}{৪}$ বাবা নিলে বাকি রইল $\frac{১}{৮}$ আর বোন ভাগ নেবার পর থাকল $\frac{১}{৮} \times ৮\frac{৩}{৫} = \frac{৩}{৪০}$। যদি ৩০ সেন্টিমিটার = $\frac{৩}{৪০}$ হয় তা হলে সবচেয়ে প্রথমে সুতোটা ছিল ৩০ : $\frac{৩}{৪০}$ = ৪০ সেন্টিমিটার বা ৪ মিটারের সমান।

Scanned by CamScanner

১৫. তিনটে মোজা নিলেই যথেষ্ট হবে, কারণ তা হলে দুটো মোজার রং সবসময়েই সমান হবে। দস্তানার বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা তত সোজা হবে না, কারণ তাদের রংই শুধু আলাদা নয়, তাদের অর্ধেক হল ডান হাতের আর বাকিটা বাঁ হাতের। এ-ব্যাপারে অন্তত ২১টা দস্তানা তুলতে হবে। এর চেয়ে কম ধরা যাক যদি ২০টা নেওয়া যায় তা হলে তার সবকটাই হয়তো হবে বাঁ হাতের (১০টা বাদামি আর ১০টা কালো)।

১৬. সেই চুলই সবশেষে উঠবে যার বয়স সবচাইতে কম। তার মানে আজ যার বয়স একদিন মাত্র।

শেষ চুলটা উঠতে কতদিন লাগবে তা হিসেব করা যাক। একজন মানুষের মাথার ১,৫০,০০০ চুলের ভেতর ৩০০০ চুল উঠে যায় প্রথম মাসে; প্রথম দু'মাসে ওঠে ৬০০০, আর প্রথম বছরে ওঠে ৩০০০ × ১২ = ৩৬,০০০। সেই হিসেবে শেষ চুল উঠে যেতে লাগবে চার বছরের একটু বেশি। এভাবেই মানুষের চুলের গড়পড়তা আয়ু হিসেব করেছি আমরা।

১৭. অনেকেই তো একটুও না ভেবে বলে বসবে ১০০। ওটা ভুল, কারণ তা হলে মূল মাইনে ওভারটাইমের চেয়ে ৭০ রুবল বেশি হয়, ১০০ রুবল নয়।

ধাঁধাটার সমাধান করতে হবে এভাবে : আমরা জানি যে উপরি-খাটুনির আয়ের সঙ্গে ১০০ রুবল যোগ দিলে মূল মাইনেটা পাওয়া যাবে। তা হলে ১৩০-এর সঙ্গে ১০০ রুবল যোগ দিলে পাওয়া যাবে দুটো মূল বেতন। কিন্তু ১৩০ + ১০০ = ২৩০, অর্থাৎ দুটো মূল বেতন হল ২৩০ রুবলের সমান। তা হলে উপরি-খাটুনির আয় বাদে আমার বেতন হল ১১৫ রুবল আর উপরি আয় ১৫ রুবল।

উত্তরটা মিলিয়ে দেখা যাক : ১১৫−১৫=১০০। আর ধাঁধাটাতেও তো তা-ই আছে।

১৮. দুটি কারণে এই ধাঁধাটা খুবই মজার। প্রথমটা হল, এমন মনে হতে পারে যে আমরা যে-গতিটা বের করতে চাই তা ১০ আর ১৫ কিলোমিটারে গড় বের করলেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ ঘণ্টায় ১২.৫ কিলোমিটার। এটা যে ভুল, তা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন নয় কিন্তু। আসলে যদি ক কিলোমিটার দূরত্ব কি করে যেতে হয়, তা হলে ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার করে গেলে $\frac{ক}{১৫}$ ঘণ্টা দরকার হবে। ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার করে কি দৌড়ালে লাগবে $\frac{ক}{১০}$ ঘণ্টা আর ১২.৫ কিলোমিটার বেগে কি করলে $\frac{ক}{১২.৫}$ বা $\frac{২ক}{২৫}$ ঘণ্টা। তাহলে সমীকরণ দাঁড়াচ্ছে :

$$\frac{২ক}{১৫} - \frac{ক}{১৫} = \frac{ক}{১০} - \frac{ক}{২৫}$$

Scanned by CamScanner

অথবা অনুপাতটা দাঁড়াচ্ছে :

$$\frac{৪}{২৫} = \frac{১}{১৫} + \frac{১}{১০}$$

এই সমীকরণটা কিন্তু ভুল, কারণ $\frac{১}{১৫} + \frac{১}{১০} = \frac{১}{৬}$ অর্থাৎ $\frac{৪}{২৪}, \frac{৪}{২৫}$ নয়।

অন্য যে-কারণে এ-ধাঁধাটা খুব মজার তা হল সমীকরণ না করেও মুখেমুখেই করে ফেলা যায় এটা।

কী করে তা হয় বলছি : যদি লোকটি ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার করে স্কি দৌড়ত আর পথে আরও দু'ঘণ্টা বেশি স্কি করত (অর্থাৎ ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার বেগে স্কি করলে যতটা হয় ততটা), তা হলে সে বাড়তি আরও ৩০ কিলোমিটার স্কি করত। আর আমরা জানি ১ ঘণ্টায় তার বাড়তি স্কি-দৌড় ৫ কিলোমিটার। তা হলে মোট দৌড়ের সময়টা হবে ৩০ : ৫ = ৬ ঘণ্টা। এ থেকেই বের হচ্ছে যে ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার করে স্কি দৌড়লে তার ৬ − ২ = ৪ ঘণ্টা লাগবে। এখন তো মোট দূরত্বটা বের করা কিছুই কঠিন নয় : ১৫ × ৪ = ৬০ কিলোমিটার।

তা হলে দুপুর ১২টায়, অর্থাৎ ৫ ঘণ্টায় ঐ জায়গায় পৌছতে তাকে কত জোরে স্কি করতে হবে তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

৬০ : ৫ = ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার।

এই উত্তরটা যাচাই করে দেখা মোটেই কঠিন নয়।

১৯. সমীকরণ না করেও এই ধাঁধাকে বহুভাবে সমাধান করা যায়।

প্রথম উপায়টা দেখাচ্ছি। জোয়ান শ্রমিক পাঁচ মিনিটে, সমস্তটা রাস্তার $\frac{১}{৪}$ এগিয়ে আসছে, আর বুড়ো শ্রমিক আসছে $\frac{১}{৬}$, অর্থাৎ জোয়ান শ্রমিকের থেকে $\frac{১}{৪} - \frac{১}{৬} = \frac{১}{১২}$ কম।

এখন বুড়ো শ্রমিক জোয়ান শ্রমিকের থেকে $\frac{১}{৬}$ পথ এগিয়ে ছিল। সুতরাং জোয়ান শ্রমিক $\frac{১}{৬} : \frac{১}{১২} = ২$ বার পাঁচ মিনিট করে হাঁটবার পর বুড়ো শ্রমিককে ধরে ফেলবে। অর্থাৎ ১০ মিনিট পর তাদের দেখা হবে।

অন্য উপায়টা আরও সহজ। কারখানায় যেতে জোয়ান শ্রমিকের থেকে বুড়ো শ্রমিকের ১০ মিনিট বেশি লাগে। সুতরাং বুড়ো শ্রমিক যদি ১০ মিনিট আগে বাড়ি থেকে রওনা হয় তা হলে তারা কারখানায় পৌছয় একই সঙ্গে। যদি মাত্র ৫ মিনিট আগে রওনা

Scanned by CamScanner

হয় তা হলে জোয়ান শ্রমিক অর্ধেক রাস্তাতেই তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। তার মানেই তাদের ১০ মিনিট পর দেখা হবে (কারণ সারা পথ যেতে তার লাগছে ২০ মিনিট)।

এছাড়াও অঙ্কের সাহায্যে অন্যভাবেও সমাধান করা যায় এটাকে।

২০. এই ধাঁধাকে সমাধান করার একটা নতুন উপায় বলছি। একই সময়ে শেষ করবে বলে টাইপিস্টরা কাজটা কীভাবে ভাগ করে নেবে সেটা বের করা যাক। (এটা তো পরিষ্কার যে একমাত্র এই উপায়েই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কাজটাকে শেষ করে ফেলা যাবে, অবশ্য যদি মাঝখানে তারা আলসেমি করে সময় নষ্ট না করে।) এখন অভিজ্ঞ টাইপিস্ট অন্যজনের চেয়ে ১.৫ গুণ তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে, সুতরাং এটাও পরিষ্কার যে তার ভাগে ১.৫ গুণ বেশি কাজ পড়বে। তা হলেই দু'জনের কাজ একই সঙ্গে শেষ হবে। সুতরাং প্রথম জন নেবে কাজটার $\frac{৩}{৫}$ আর দ্বিতীয় জন $\frac{২}{৫}$।

সাধারণভাবে, এতেই ধাঁধাটার সমাধান হল। এখন প্রথম টাইপিস্টের তার ভাগের কাজটা করতে, অর্থাৎ $\frac{৩}{৫}$ করতে কত সময় লাগবে সেটা বের করতে হবে। আমরা জানি যে সমস্তটা কাজ করতে তার লাগে ২ ঘণ্টা, তা হলে $\frac{৩}{৫}$ করতে সময় লাগবে $২ \times \frac{৩}{৫} =$ ১.২ ঘণ্টা। অন্য টাইপিস্টকেও এই সময়ের ভেতরই তার কাজ শেষ করতে হবে।

তা হলে সবচেয়ে কম সময় ১ ঘণ্টা ১২ মিনিটেই দু'জনে কাজটা শেষ করে ফেলতে পারবে।

২১. তোমরা যদি মনে করে থাক যে ছোট চাকাটা তিনবার ঘুরবে, তা হলে খুবই ভুল করেছ। ওটা ঘুরবে চারবার।

কেন এমন হল তা দেখতে চাও? এক টুকরো কাগজ নাও আর তার ওপরে দুটো সমান মাপের মুদ্রা রাখো, দুটো ২০ কোপেক মুদ্রা হলেই চলবে (৪ নং ছবি)। এখন নিচের মুদ্রাটা শক্ত করে চেপে ধরে ওপরের মুদ্রাটাকে চারপাশে ঘোরাও। এবার একটা মজার ব্যাপার দেখতে পাবে। উপরের মুদ্রাটা অন্য মুদ্রাটার নিচে এসে পৌছতে পৌছতে নিজেও পুরো একবার পাক খেয়ে আসবে। মুদ্রার উপরের ছাপটা কীভাবে থাকছে তা দেখলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। আবার নিচের মুদ্রাটার (যেটা আমরা নাড়াব না) চারপাশে এটা যখন সম্পূর্ণ ঘুরে আসবে, তখন নিজে ঘুরবে দু'বার।

সাধারণভাবে বলা যায় কোনো জিনিস বৃত্তাকার পথে ঘুরে এলে আমাদের গুনতিতে যা হবে তার চেয়েও একবার বেশি সে নিজে ঘুরে আসে। সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করবার সময় যদি পৃথিবীর নিজের আবর্তনকে সূর্যের দিক থেকে না দেখে অন্য কোনো

Scanned by CamScanner

তারার দিক থেকে দেখা হয়, তা হলে দেখা যাবে ৩৬৫ $\frac{১}{৪}$ দিনের বদলে পৃথিবীর আবর্তন হচ্ছে ৩৬৬ $\frac{১}{৪}$ দিন। উপরের ব্যাপারটা থেকেই এই জিনিসটার সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে। তা হলে বুঝতে পারছ নাক্ষত্রিক দিন থেকে সৌরদিন বড় হয় কেন?

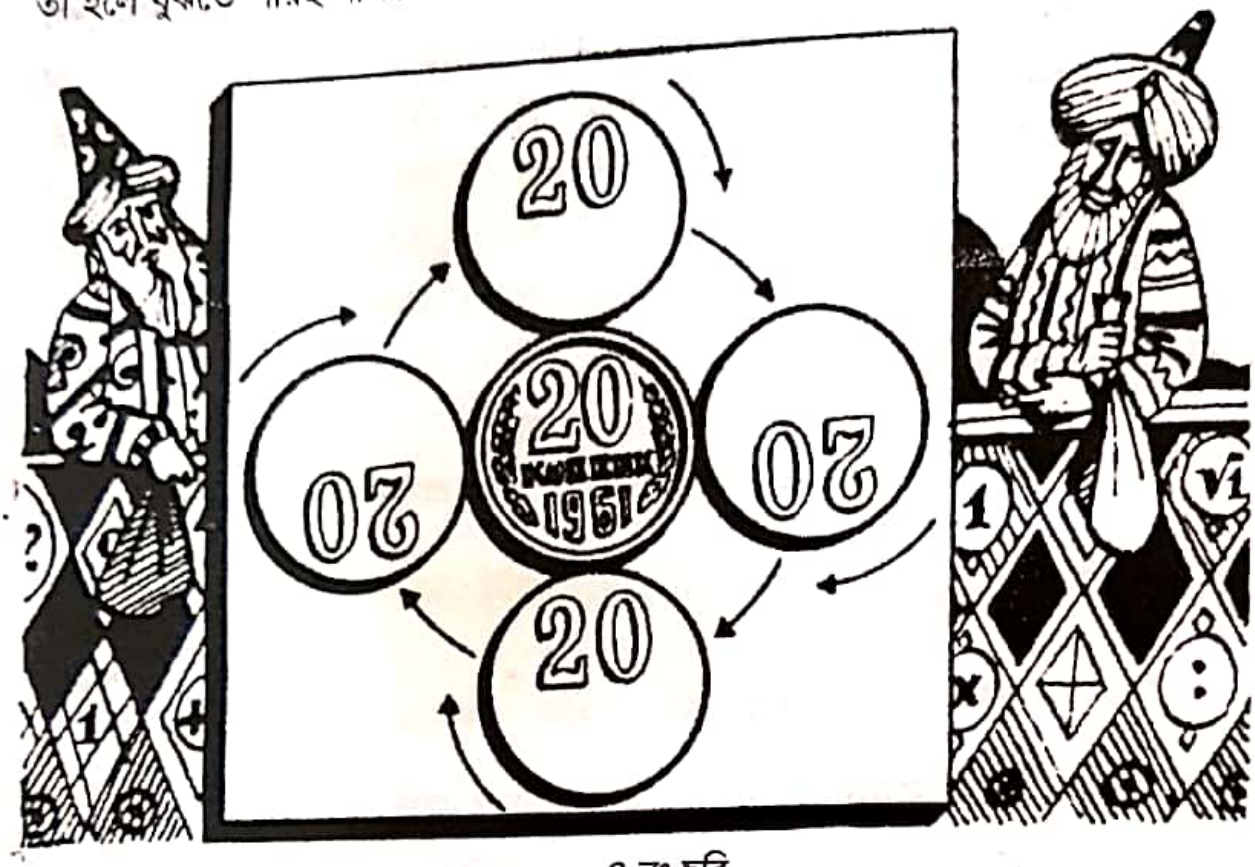

৪ নং ছবি

২২. গণিতের সাহায্যে এর সমাধান করা একটা জটিল ব্যাপার, কিন্তু বীজগণিতের সাহায্য নিলে তা খুবই সোজা হয়ে যায়। ধরা যাক ব বছর বর্তমান বয়স। তা হলে তিন বছর পরে বয়স হবে ব + ৩, আর তিন বছর আগে বয়স হবে ব−৩, তা হলে আমাদের সমীকরণটা দাঁড়াচ্ছে

$$৩(ব + ৩) - ৩ (ব - ৩) = ব।$$

এটাকে সমাধান করলে দাঁড়াচ্ছে ব ≡ ১৮। ধাঁধাবিশারদের বয়স ছিল ১৮ বছর।

এটাকে যাচাই করে দেখা যাক : তিন বছর পরে তার বয়স হবে ২১ ; তিন বছর আগে ছিল ১৫।

তফাতটা হল

$$(৩ \times ২১) - (৩ \times ১৫) = ৬৩ - ৪৫ = ১৮$$

২৩. আগের ধাঁধাটার মতো এটাও সরল সমীকরণের সাহায্যে সমাধান করা চলবে। ছেলের বয়স যদি হয় ব বছর, তা হলে বাবার বয়স হল ২ব বছর। ১৮ বছর আগে তাদের

Scanned by CamScanner

দু'জনের বয়সই ছিল ১৮ বছর কম : বাবার বয়স ছিল ২ব − ১৮ আর ছেলের বয়স ছিল ব−১৮। আমরা জানি যে ঐ সময় বাবার বয়স ছিল ছেলের বয়সের তিন গুণ

$$৩(ব - ১৮) = ২ব - ১৮$$

সমীকরণটা সমাধান করলে আমরা পাচ্ছি যে ব ৩৬-এর সমান। ছেলের বয়স ৩৬ আর বাবার বয়স ৭২।

২৪. ধরে নেওয়া যাক যে প্রথমে আমার ছিল ক সংখ্যার রুবল আর খ সংখ্যার ২০ কোপেক। বাজারে যাবার সময় আমার ছিল (১০০ক + ২০খ) কোপেক। যখন ফিরলাম তখন ছিল মাত্র (১০০ খ + ২০ক) কোপেক।

আমরা জানি যে এই পরের অঙ্কটা প্রথম অঙ্কটার তিন ভাগের এক ভাগ। তা হলে

$$৩ (১০০খ + ২০ক) = ১০০ক + ২০খ$$

এটাকে সমাধান করলে আমরা পাই

$$ক = ৭খ$$

এখন খ যদি ১ হয়, তা হলে ক = ৭। এইরকম ধরে নিলে বাজারে যাবার সময় আমার ছিল ৭.২০ রুবল। কিন্তু এটা ভুল, কারণ ধাঁধাতেই বলে দেওয়া আছে আমার আছে ১৫ রুবল মতন ছিল।

যদি খ = ২ হয়, তা হলে কী দাঁড়ায় দেখা যাক। তা হলে ক = ১৪ হয়। তা হলে একেবারে প্রথমে আমার হাতে ছিল ১৪.৪০ রুবল, ধাঁধার শর্তগুলির সঙ্গে বেশ মিলে যায় এটা।

যদি খ = ৩ ধরি, তা হলে টাকাটা খুবই বেশি হয়ে যায়, ২১.৬০ রুবল।

তা হলে একমাত্র উপযুক্ত উত্তর হল ১৪.৪০ রুবল। বাজার শেষ করার পর আমার কাছে ছিল ১ রুবলের দুটো আর ২০ কোপেকের ১৪টা মুদ্রা, অর্থাৎ ২০০ + ২৮০ = ৪৮০ কোপেক। এটা কিন্তু প্রথম যে-টাকাটা ছিল তার ঠিক তিন ভাগের এক ভাগ (১৪৪০ : ৩ = ৪৮০)। তা হলে কেনাকাটা করতে আমার খরচ হয়েছিল ১৪.৪০−৪.৮০ = ৯.৬০ রুবল।

Scanned by CamScanner

২৫. তুমি গুনতে জান?

তিন বছরের বেশি বয়সের কাউকে যদি কথাটা জিজ্ঞেস করো তা হলে সম্ভবত সে অপমান বোধ করবে। সত্যিই তো, ১, ২, ৩, ৪ গুনে যেতে তো আর কোনো দক্ষতার দরকার নেই। তবু একথা সত্যি যে কখনো কখনো এই গোনাগুনতির ব্যাপারটাই খুব গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়। তাই না? আসলে জিনিসটার সবটাই নির্ভর করে কী গুনছে তার ওপর। উদাহরণ দেওয়া যাক : একটা বাক্সের ভেতরের পেরেকগুলো গুনে ফেলা মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু ধরা যাক বাক্সটায় পেরেক ছাড়াও কতকগুলি স্ক্রু আছে, আর কোনটা কতটা করে আছে তোমাকে তাই গুনতে বলা হয়েছে। এখন তা হলে কী করবে তুমি? স্ক্রু থেকে পেরেকগুলোকে আলাদা করে তারপর গুনবে?

মেয়েদের কিন্তু এই কাজটাই করতে হয় কাপড়চোপড় ধোপাবাড়ি পাঠাবার সময়। তাদের প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাগ করে জামা, তোয়ালে, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি বেছে নিতে হয়। এই একঘেয়ে কাজটা সারবার পরে তারা গুনতে শুরু করে।

তুমি যদি এভাবে গুনতি করো, তা হলে গুনবার নিয়মটা জানো না তুমি। এই নিয়মটার অসুবিধে হয়, একঘেয়ে লাগে, কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদি পেরেক বা স্ক্রু অথবা কাপড়চোপর গুনতে হয় তা হলে অবশ্য নিয়মটা মোটামুটি খারাপ নয়। কিন্তু ধরো তুমি একজন বনরক্ষক, তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে প্রতি হেক্টর জমিতে কতগুলি পাইন, ফার, বার্চ বা অ্যাসপেন গাছ আছে। এখানে কিন্তু গাছ হিসেবে ভাগ করে ফেলা সম্ভব নয়। তুমি কী করবে? পাইন, বার্চ, ফার ভা অ্যাসপেন আলাদা আলাদা করে গুনবে? যদি তা করো, তা হলে জঙ্গলটাকে তোমাকে চারবার ঘুরে আসতে হবে।

একবার ঘুরেই গুনতি করে ফেলার একটা সহজ উপায় আছে, বনরক্ষকরা তা-ই ব্যবহার করে। পেরেক আর স্ক্রু দিয়ে এটা কী করে করা যায় তা তোমাদের দেখাচ্ছি।

একটা বাক্সের ভেতরের পেরেক আর স্ক্রুগুলো ভাগ না করে গুনতে হলে তোমার সবচেয়ে প্রথমে দরকার হবে একটা পেন্সিল, আর নিচের মতো ছককাটা একটা কাগজ।

এরপর গুনতি শুরু করে দাও। বাক্স থেকে একটা কিছু ওঠাও, যদি এটা পেরেক হয়, তা হলে পেরেকের সারিতে একটা দাগ দাও। স্ক্রুর বেলাতেও তা-ই করো। এভাবে বাক্স খালি হওয়া পর্যন্ত দাগ মেরে যাও। পেরেকের সারিতে তুমি যে কয়টা দাগ পাবে সেই কয়টা পেরেকই তোমার বাক্সে ছিল। স্ক্রুর বেলাতেও একই কথা।

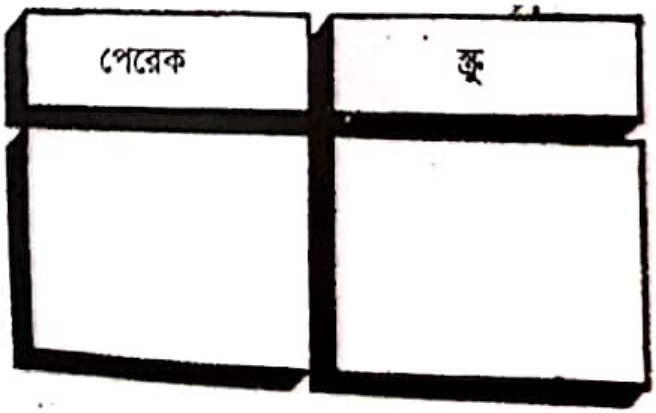

এরপর, তোমাকে যা করতে হবে তা হল শুধু যোগটা করে ফেলা।

এই দাগগুলো যোগ করার কাজটা আরও তাড়াতাড়ি আর সহজে করা যায়, যদি পাঁচটা করে দাগ একসঙ্গে দিয়ে ছোট চৌখুপীর মতো করে সাজাও (৫ নং ছবি)।

Scanned by CamScanner

এ ধরনের চৌখুপীগুলি জোড়ায় জোড়ায় সাজালে সবচেয়ে সুবিধের হয়। অর্থাৎ প্রথম ১০টা দাগের পর ১১ নম্বরের দাগটা নতুন আর এক সারিতে বসাও।

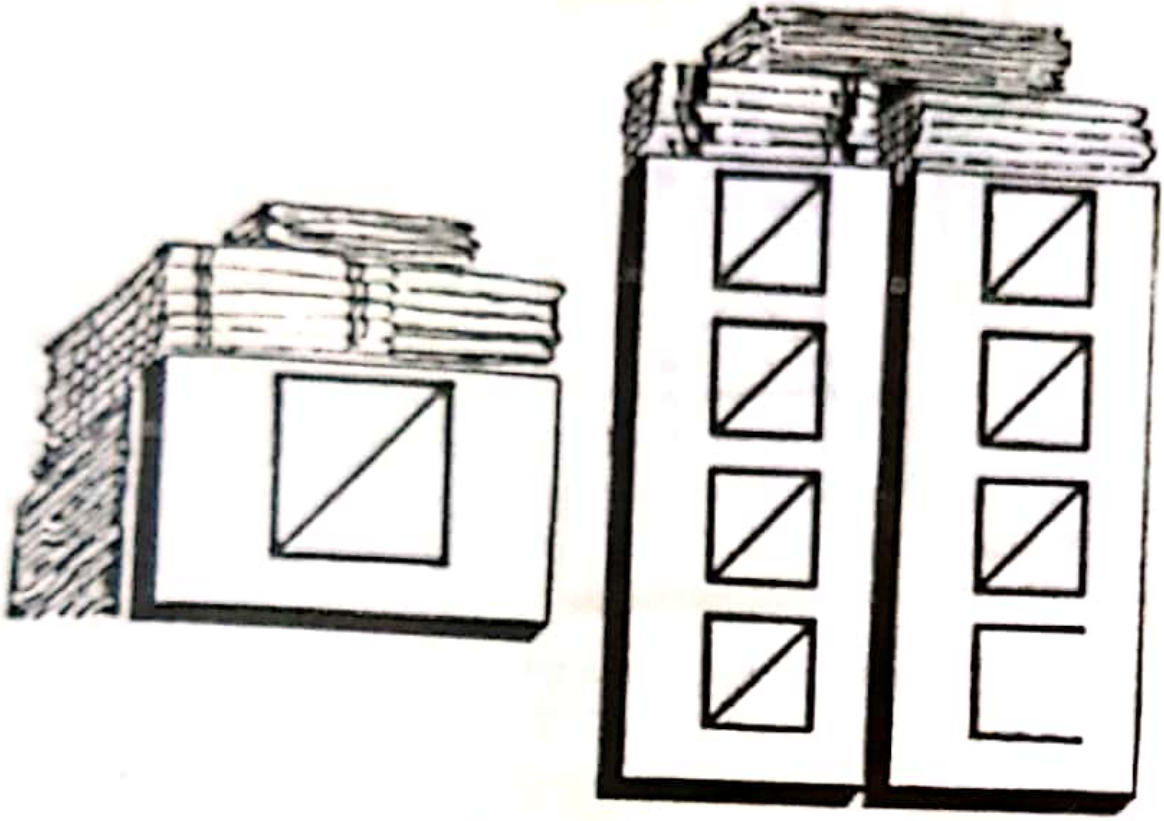

৫ নং ছবি। দাগ পাঁচটা হওয়া চাই

৬নং ছবি। গুনতির ফলাফল এমন ভাবে সাজাতে হবে

দ্বিতীয় সারিতে দুটো চৌখুপি হয়ে গেলে তৃতীয়টা শুরু করো। এইভাবে চলবে। তা হলেই তোমার দাগগুলো ৬ নং ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে তেমন হবে।

এগুলোকে গুনতি করা খুবই সোজা। কারণ স্পষ্টই দেখতে পাবে প্রত্যেকটাতে ১০টা করে দাগ মিলিয়ে তিনটে সারি রয়েছে। তা ছাড়া আছে ৫ দাগের একটা চৌখুপি আর তিন দাগের একটা অসমাপ্ত ঘর, অর্থাৎ ৩০ + ৫ + ৩ = ৩৮।

অন্য ধরনের ঘরও ব্যবহার করতে পার। একটা পুরো চৌখুপিকে অনেক সময় ১০ বলে ধরা হয় (৭ নং ছবি)।

ভিন্ন ভিন্ন জাতের গাছ গুনতি করতে হলেও একই নিয়ম চলবে। এক্ষেত্রে কেবল দুই সারির বদলে তোমাকে চার সারি গুনতে হবে। এ ছাড়া পাশাপাশি সারি বসলে আরও সুবিধে হবে, যেমন ৮ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

এরপর প্রতি সারিতে মোট কতটা হল, তা বের করা খুবই সোজা (৯ নং ছবি) :

পাইন	৫৩	বার্চ	৪৬
ফার	৭৯	অ্যাসপেন	৩৭

Scanned by CamScanner

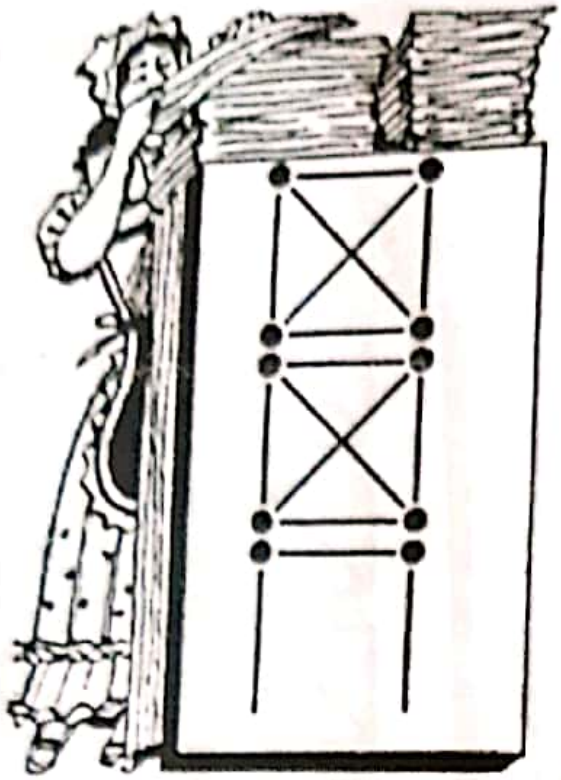

ডাক্তারি কাজে রক্তের ফোঁটার শ্বেত ও লোহিত কণিকা গোনবার সময়েও এই নিয়ম মানা হয়। এইভাবে ধোপাবাড়ির কাপড়চোপড় ভাগ করলে মেয়েরা তাঁদের প্রচুর সময় আর মেহনত বাঁচাতে পারবেন।

তা হলে, সবচেয়ে ভালো উপায়ে কীভাবে জমির গাছ গুনে ফেলা যায় তা শিখলে তোমরা। একটা ছক আঁকো, প্রত্যেক আলাদা সারিতে আলাদা আলাদা গাছের নাম লেখো। যদি অন্য কোনো গাছ পাও তার জন্য কয়েকটা সারি আলাদা করে রাখো। তারপর গুনতে শুরু করো (১০ নং ছবি)।

৭ নং ছবি। প্রত্যেকটি বর্গক্ষেত্রে ১০-এর প্রতীক

২৬. বনের গাছ গুনব কেন?

সত্যিই তো, কেন? যারা শহরে থাকে তারা কাজটাকে অপ্রয়োজনীয় বলে ভাবে। লেভ তলস্তোয়ের 'আন্না কারেনিনা'তে অব্‌লোন্‌স্কি একটা বন বেচে ফেলার সময় কৃষিকাজ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ লেভিন নামে তার এক আত্মীয় তাকে জিজ্ঞেস করেছিল :

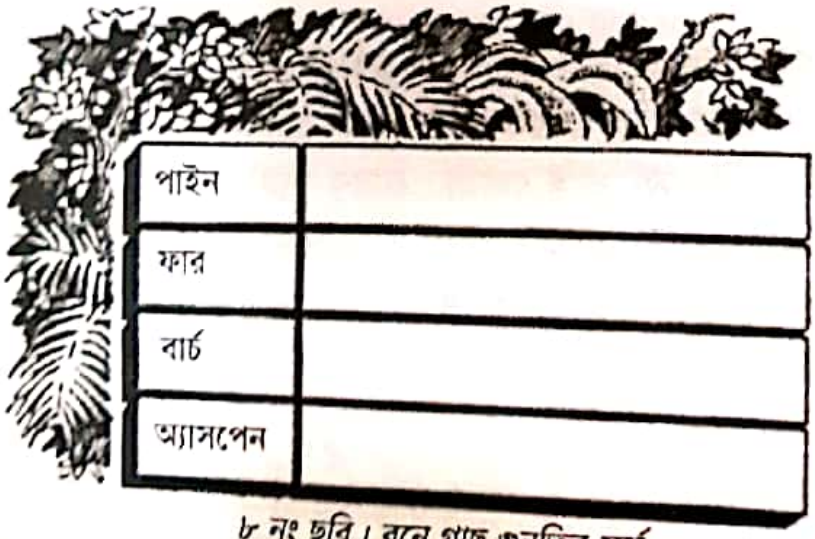

৮ নং ছবি। বনে গাছ গুনতির ফর্ম

"গাছগুলো গুনেছেন?"

অব্‌লোন্‌স্কি অবাক হয়ে বলল, "গাছগুলো গুনব? বেড়ে বলেছ। সমুদ্রপারের বালি বা তারার ছ'টা গুনতে বসব নাকি! খুব প্রতিভাবান লোকেরা অবশ্য ....." লেভিন তাকে বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু রিয়াবিনিনের মতো (ব্যবসাদার) বিরাট প্রতিভা তা পেরেছিল। তা ছাড়া কোনো চাষিই গুনতি না করে জিনিস কেনে না।"

Scanned by CamScanner

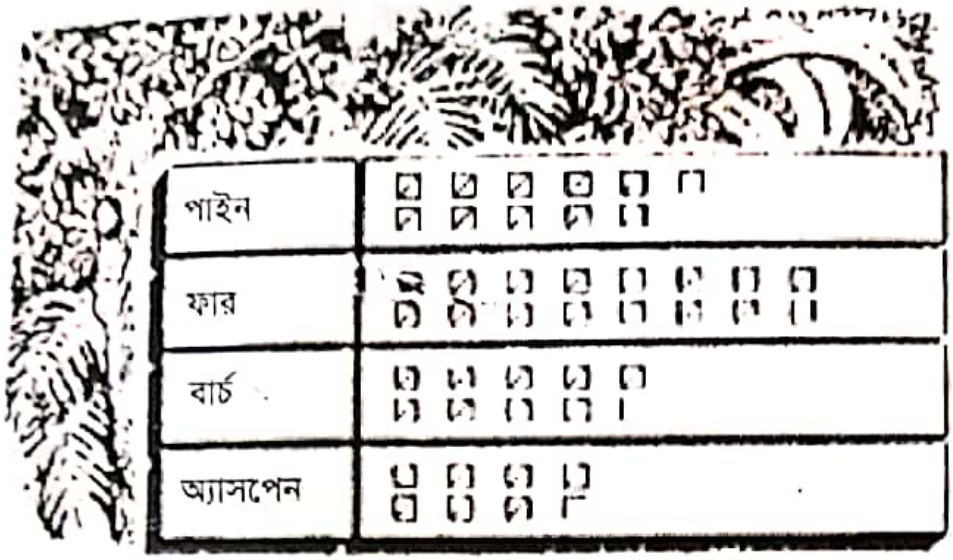

পাইন	
ফার	
বার্চ	
অ্যাসপেন	

৯ নং ছবি। গুনতির পর ফর্মের চেহারা

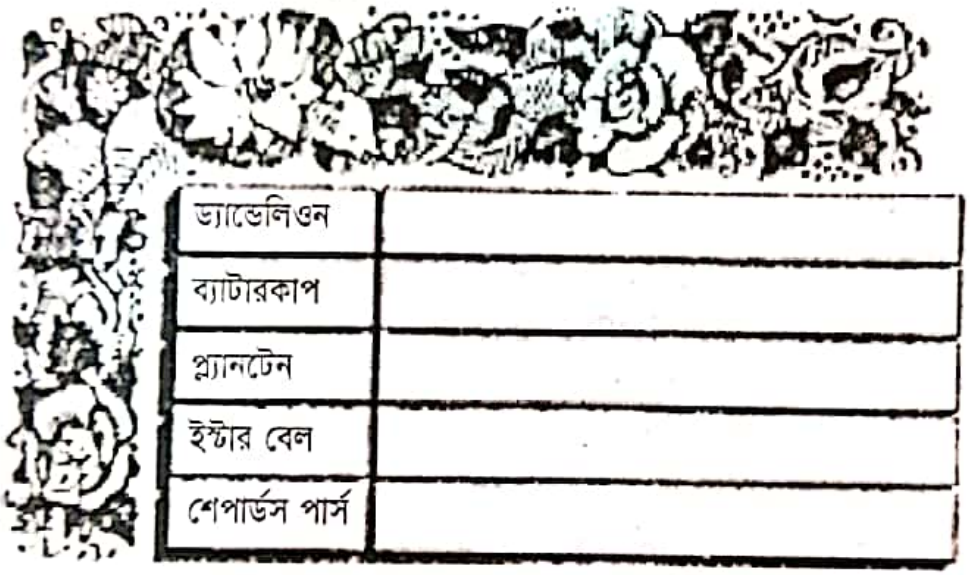

ভ্যাভেলিওন	
ব্যাটারকাপ	
প্ল্যানটেন	
ইস্টার বেল	
শেপার্ডস পার্স	

১০ নং ছবি। গাছ গুনতির নমুনা

কতখানি (ঘন মিটার) কাঠ আছে তা জানবার জন্য বনের গাছ গোনা হয়। সব গাছ গোনা হয় না, শুধু একটা অংশে, মনে করো ০.২৫ বা ০.৫ হেক্টর জমিতে গোনা হয়। একটু যত্ন নিয়ে এমন জায়গা বেছে নেওয়া হয় যেখানে গাছগুলো মাঝারি রকমের ঘন হয়ে গজিয়েছে আর গাছের উচ্চতাও প্রায় মাঝামাঝি রকম আছে। এজন্য অবশ্য চোখটা অভিজ্ঞ হওয়া দরকার। প্রত্যেকটা জাতের মোট কটা করে গাছ আছে তা জানলেই যথেষ্ট হবে না। গাছগুলোর গুঁড়ি কতটা মোটা তাও জানতে হবে, অর্থাৎ কতগুলো ২৫ সে.মি. মোটা, কতগুলো ৩০, ৩৫ সে.মি. বা বেশি মোটা। সহজ করে আমরা যে চার সারির ছকটা দেখিয়েছি, সম্ভবত এক্ষেত্রের ছকটায় তার চেয়ে বেশি সারি হবে। এই নিয়ম ছাড়া সাধারণভাবে গুনতে গেলে বনের ভেতর আমাদের কতবার ঘোরাঘুরি করতে হবে তা তো বুঝতেই পারছ।

তা হলে দেখছ, একই জিনিস গুনতে হলে ব্যাপারটা কত সহজ এবং সরল। কিন্তু বিভিন্ন জিনিস গুনতে হলে যে-নিয়মটা এইমাত্র দেখানো হল তা-ই ব্যবহার করতে হবে। এরকম একটা নিয়ম যে আছে অনেকের তা-ই জানা নেই।

Scanned by CamScanner

২৭. পাঁচ রুবলের বদলে একশো রুবল

একবার এক জাদুকর দর্শকদের এই লোভনীয় প্রস্তাবটা দিয়েছিল :

"৫০ কোপেক, ২০ কোপেক আর ৫ কোপেক মিলিয়ে মোট ২০টি মুদ্রায় কেউ যদি আমাকে ৫ রুবল দিতে পারেন তা হলে আমি তাঁকে ১০০ রুবল দেব। পাঁচ রুবলে একশো রুবল! নেবেন নাকি কেউ?"

সারাটা প্রেক্ষাঘর নিস্তব্ধ।

কেউ-কেউ কাগজ, পেন্সিল বাগিয়ে ধরে এমন একটা সুযোগ নেবার জন্য হিসেব কষতে শুরু করেছে। জাদুকরকে বিশ্বাস করে তার প্রস্তাবটা মেনে নিতে কেউই রাজি নয়।

জাদুকর বলে চলল, "১০০ রুবলের জন্য রুবলকে আপনারা খুব বেশি বলে মনে করছেন দেখছি! আচ্ছা বেশ, ২০টি মুদ্রায় ৩ রুবল নিতে রাজি আছি আমি, তার বদলে দেব ১০০ রুবল। যাঁরা নেবেন লাইন করে দাঁড়ান।"

কেউই লাইনে দাঁড়াতে এল না। সহজে টাকা আয়ের এই সুযোগটা নিতে কেউই ব্যস্ততা দেখাল না।

"কী ব্যাপার! ৩ রুবলও খুব বেশি মনে হচ্ছে আপনাদের? আচ্ছা, আচ্ছা, আরও এক রুবল কমিয়ে দিচ্ছি আমি, ২০টা মুদ্রায় ২ রুবল দিন আপনারা। এবার হল তো?"

তবু কেউ সুযোগটা নিতে এল না। জাদুকর বলে চলল :

"খুচরো মুদ্রাগুলি নেই বোধহয় আপনাদের কাছে? আচ্ছা বেশ, আমি বিশ্বাস করছি আপনাদের। কোন মুদ্রা কতটা করে দেবেন সেইটা শুধু লিখে দিন আমাকে। আমার দিক থেকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যাঁরা এসব মুদ্রার একটি তালিকা আমাকে দেবেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি ১০০ রুবল দেব!"

২৮. এক হাজার

একই অঙ্ক আট বার ব্যবহার করে ১০০০ লিখতে পার?

অঙ্গুলো ছাড়াও অঙ্কের বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করতে পার।

২৯. চব্বিশ

৮ অঙ্কটাকে তিনবার ব্যবহার করে ২৪ লেখা খুবই সহজ : ৮ + ৮ + ৮ অন্য কোনো একই অঙ্ককে তিনবার ব্যবহার করে এইরকম ২৪ লিখতে পার? এ-ধাঁধাটার একাধিক উত্তর হয়।

৩০. তিরিশ

৫-কে তিনবার ব্যবহার করে সহজেই ৩০ লেখা চলে : ৫ × ৫ + ৫। অন্য কোনোও অঙ্ককে তিনবার ব্যবহার করে ৩০ লেখা একটু কঠিন।

চেষ্টা করে দ্যাখো না! অনেকগুলো উত্তর হতে পারে এর।

Scanned by CamScanner

৩১. লুপ্ত সংখ্যা বের করা

নিচের এই গুণনটায় অর্ধেকেরও বেশি অঙ্কের জায়গায় * বসানো আছে।

১

× ৩*২

৩

৩*২*

*২*৫

১*৮*৩০

অঙ্কগুলো বের করতে পারো?

৩২. সংখ্যাগুলো কী বলো তো?

ঐ একই ধরনের আর-একটা ধাঁধা দেওয়া হল।

তোমাদের এই হারানো অঙ্কগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

**৫

× ১**

২**৫

১৩*০

***

৪*৭৭*

৩৩. ভাগ

নিচের ধাঁধাটার হারানো অঙ্গগুলো বের করো তো :

৩২৫)*২*৫*(১**

−***

*০**

−*৯**

৫

−*৫*

৩৪. ১১ দিয়ে ভাগ

কোনো অঙ্ককে দু'বার ব্যবহার না করে নয়টা অঙ্ক দিয়ে এমন কয়েকটা সংখ্যা লেখো যাদের ১১ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়।

এদের ভেতর প্রথমে লেখো সবচেয়ে বড়টা, তারপর সবচেয়ে ছোটটা।

Scanned by CamScanner

৩৫. মজার গুণন

নিচের উদাহরণটা ভালো করে দ্যাখো :

$৪৮ \times ১৫৯ = ৭৬৩২$

এর ভেতরে মজার ব্যাপার হল নয়টা অঙ্কই একেবারে আলাদা। এইরকম আরও কয়েকটা উদাহরণ দিতে পার? এরকম অঙ্ক সত্যিই যদি থাকে তা হলে মোট কটা আছে বলো তো?

৩৬. সংখ্যার ত্রিভুজ

১১ নং ছবির ত্রিভুজের বৃত্তগুলির ভেতর এমনভাবে নয়টা অঙ্ক লেখো যাতে প্রতি বাহুর যোগফল হয় ২০। একই অঙ্ক দু'বার বসানো চলবে না।

৩৭. আরও একটা সাংখ্যিক ত্রিভুজ

ঐ একই ত্রিভুজের (১১ নং ছবি) বৃত্তে কোনো অঙ্ককে দু'বার ব্যবহার না করে নয়টা অঙ্ক লেখো। এবার কিন্তু যোগফল হওয়া চাই ১৭।

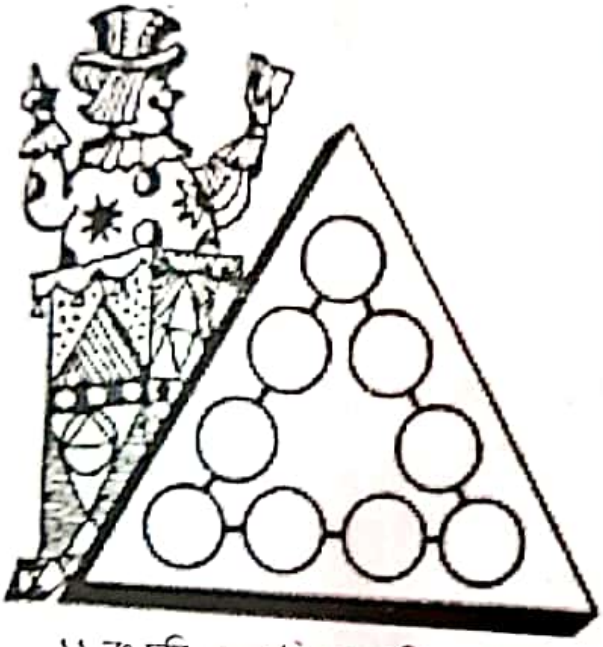

১১ নং ছবি। বৃত্তগুলিতে নয়টি অঙ্ক বসাও

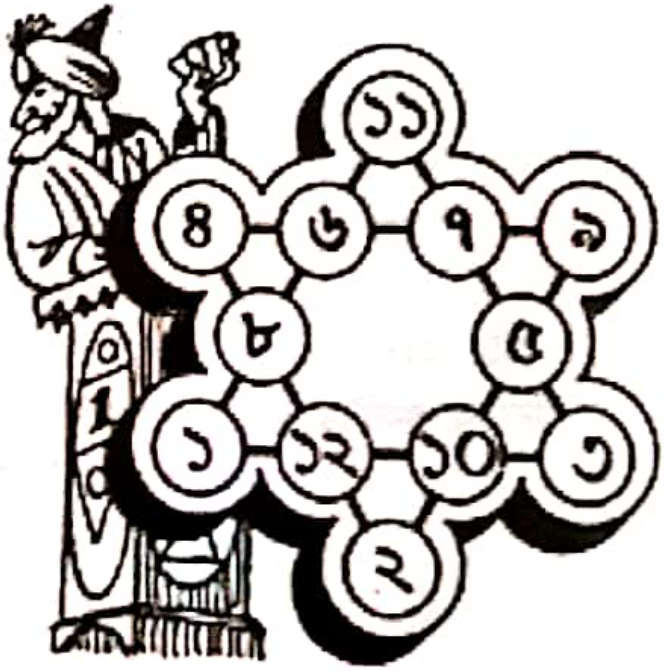

১২ নং ছবি। ছয়কোনা সাংখ্যিক তারা

৩৮. যাদু-তারা

ছয়-মাথাওলা তারাটা (১২ নং ছবি) খুব মজার, প্রত্যেক সারির যোগফল সমান :

$৪ + ৬ + ৭ + ৯ = ২৬$

$৪ + ৮ + ১২ + ২ = ২৬$

$৯ + ৫ + ১০ + ২ = ২৬$

$১১ + ৬ + ৮ + ১ = ২৬$

$১১ + ৭ + ৫ + ৩ = ২৬$

$১ + ১২ + ১০ + ৩ = ২৬$

Scanned by CamScanner

অবশ্য মাথাগুলোর যোগসংখ্যা অন্যরকম :

$$৪ + ১১ + ৯ + ৩ + ২ + ১ = ৩০$$

সংখ্যাগুলো এমনভাবে সাজাতে পার যাতে এই গলদটা দূর হয়ে প্রত্যেক সারির আর মাথার যোগফল হয় ২৬?

২৭–৩৮ নম্বর ধাঁধার উত্তর

৩৬. তিনটে ধাঁধারই কোনো সমাধান নেই। এদের সমাধানের জন্য জাদুকর এবং আমি যে কোনো পুরস্কার ঘোষণা করতে পারি। এটা প্রমাণ করার জন্য বীজগণিতের সাহায্যে তিনটেকেই বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

পাঁচ রুবলের হিসেব–ধরে নেওয়া যাক এটা সম্ভব আর তার জন্য ৫০ কোপেকের মুদ্রা দরকার ক সংখ্যা, ২০ কোপেকের মুদ্রা দরকার খ সংখ্যা, আর ৫ কোপেক দরকার গ সংখ্যা। তা হলে এই সমীকরণটা পাওয়া গেল :

$$৫০ক + ২০ খ + ৫গ = ৫০০$$

এ ছাড়াও, এই ধাঁধাটায় আছে যে মুদ্রার মোট সংখ্যা হল ২০। তা হলে আমরা আর-একটা সমীকরণ পেলাম :

$$ক + খ + গ = ২০$$

প্রথম সমীকরণ থেকে দ্বিতীয়টাকে বিয়োগ করলে পাওয়া যায় :

$$৯ক + ৩খ = ৮০$$

একে ৩ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় :

$$৩ক + খ = ২৬\frac{২}{৩}$$

কিন্তু ৩ক, অর্থাৎ ৫০ কোপেকের মোট মুদ্রার সংখ্যাকে ৩ দিয়ে গুণ করলে তা একটা পূর্ণসংখ্যা হবে। খ, অর্থাৎ ২০ কোপেকের মুদ্রার সংখ্যাও হবে পূর্ণসংখ্যা। সুতরাং এই দুটো সংখ্যার যোগফল কোনো ভগ্নাংশ হতে পারে না। সুতরাং এই ধাঁধাটা সমাধান করা যাবে এমন মনে করাই বোকামি। এর সমাধান হবে না।

ঐ একইভাবে পাঠকরা বুঝতে পারবে যে 'কম রুবলের হিসেবগুলোও' সমাধানযোগ্য নয়। প্রথম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ৩ রুবলের হিসেবে) এই সমীকরণটা পাওয়া যায় :

$$৩ক + খ = ১৩\frac{১}{৩}$$

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (২ রুবলের হিসেবে) :

$$৩ক + খ = ৬\frac{২}{৩}$$

তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, দু'ক্ষেত্রেই ভগ্নাংশ সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে।

সুতরাং এই ধাঁধাগুলির সমাধানের জন্য বিরাট টাকার পুরস্কার ঘোষণা করতে জাদুকরকে কোনো ঝুঁকিই নিতে হয়নি। টাকাটা তো তাকে কখনোই দিতে হবে না!

Scanned by CamScanner

ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম হত, যদি ২০টি মুদ্রায় ৫, ৩ বা ২ রুবলের হিসেব না করে হিসেব করতে হত ৪ রুবলের। ধাঁধাটা তখন সহজেই হয়ে যেত, আর সাতটা বিভিন্ন ধরনে তা করা যেত।*

২৮. ৮৮৮ + ৮৮ + ৮ + ৮ + ৮ = ১০০০

এর আরও উত্তর হয়।

২৯. দুটো উত্তর হল :

$$২২ + ২ = ২৪ ; ৩^৩ - ৩ = ২৪$$

৩০. তিনটে উত্তর দেওয়া হল :

$$৬ \times ৬ - ৬ = ৩০; ৩^৩ + ৩ = ৩০; ৩৩ - ৩ = ৩০$$

৩১. নিচের নিয়মে হিসেব করে গেলে আস্তে আস্তে হারানো অঙ্কগুলো বের হয়ে আসবে। সুবিধার জন্য প্রতি সারিকে একটা নম্বর দেওয়া যাক :

* ১ * ..... প্রথম

× ৩ * ২ ..... দ্বিতীয়

* ৩ * ..... তৃতীয়

৩ * ২ * ..... চতুর্থ

* ২ * ৫ ..... পঞ্চম

১ * ৮ * ৩০ ..... ষষ্ঠ

তৃতীয় সারির শেষ সংখ্যা যে ০ হবে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে, কারণ ষষ্ঠ নম্বর লাইনের শেষে রয়েছে ০।

এরপর প্রথম সারির শেষ *-এর অঙ্কটা বের করা যাক : এটা এমন একটা অঙ্ক যাকে ২ দিয়ে গুণ করলে ডানদিকের অঙ্কটা হয় ০, আর ৩ দিয়ে গুণ করলে ডানদিকের অঙ্কটা হয় ৫ (পঞ্চম সারির শেষ অঙ্ক ৫)। এরকম অঙ্ক মাত্র একটিই হয়-৫।

দ্বিতীয় সারির *-এর আড়ালে কোন অঙ্ক লুকিয়ে আছে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। তা হল ৮, কারণ একমাত্র এই অঙ্ককেই ১৫ দিয়ে গুণ করলে এমন একটা উত্তর হয় যার ডানদিকে থাকে ২০ (চতুর্থ সারি)।

এরপর পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে চতুর্থ সারির শেষে আছে ০। (তৃতীয় ও ষষ্ঠ সারিগুলির ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কগুলো দেখলেই বোঝা যাবে!)

সবশেষে প্রথম সারির প্রথম * যে ৪ তা পরিষ্কার হয়ে যাবে, কারণ একমাত্র ৪-কে ৮ দিয়ে গুণ করলেই এমন সংখ্যা পাওয়া যায় যার প্রথমে থাকে ৩ (চতুর্থ সারি)।

---

* যে যে উত্তর সম্ভব তার মধ্যে একটা দেওয়া হল : ছয়টা ৫০ কোপেকের মুদ্রা, দুটো ২০ কোপেকের মুদ্রা আর ৫ কোপেকের মুদ্রা বারোটা।

Scanned by CamScanner

এরপর বাকি অজানা অঙ্কগুলোকে বের করতে কোনো মুশকিল নেই : যে-দুটো উৎপাদক আমরা বের করেছি তাকে গুণ করলেই যথেষ্ট হবে।

সবেশেষে গুণনের অঙ্কটা দাঁড়াল এই :

```
     ৪১৫
   × ৩৮২
     ৮৩০
    ৩৩২০
   ১২৪৫
  ১৫৮৫৩০
```

৩২. এ-ধাঁধাটাও একই উপায়ে সমাধানযোগ্য।

উত্তরটা দাঁড়াবে :

```
     ৩২৫
   × ১৪৭
    ২২৭৫
   ১৩০০
   ৩২৫
   ৪৭৭৭৫
```

৩৩. সবগুলো সংখ্যা উদ্ধার করলে ধাঁধার অঙ্কটা দাঁড়ায় :

```
৩২৫)৫২৬৫০(১৬২
    −৩২৫
      ২০১৫
    −১৯৫০
        ৬৫০
      −৬৫০
```

৩৪. এই ধাঁধাটার সমাধান করতে হলে ১১ দিয়ে বিভাজ্য এমন সংখ্যার নিয়মকানুন জানতে হবে। কোনো সংখ্যার ডান দিক থেকে গুনে জোড়ক্ষেত্রের সংখ্যাগুলির যোগফল আর বিজোড়ক্ষেত্রের সংখ্যাগুলির যোগফল দুটোকে বিয়োগ করলে যদি উত্তরটা ০ হয় অথবা ১১ দিয়ে ভাগ দিলে মিলে যায় তা হলে সেই সংখ্যাটা ১১ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে। একটা উদাহরণ দেখা যাক–২,৩৬,৫৮,৯০৪।

জোড়ক্ষেত্রের সংখ্যার যোগফল :

$$৩ + ৫ + ৯ + ৪ = ২১$$

আবার বিজোড়ক্ষেত্রের সংখ্যার যোগফল :

$$২ + ৬ + ৮ + ০ = ১৬$$

বিয়োগফল (বড়টা থেকে ছোটটাকে বিয়োগ করে) হল :

$$২১ − ১৬ = ৫$$

Scanned by CamScanner

একে ১১ দিয়ে ভাগ করলে মেলে না। তা হলে এ সংখ্যাটা ১১ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

আর-একটা সংখ্যা ধরা যাক, যেমন–৭৩,৪৪,৫৩৫।

৩ + ৪ + ৩ = ১০ ৭ + ৪ + ৫ + ৫ = ২১ ২১ − ১০ = ১১

১১-কে ১১ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়, সুতরাং সংখ্যাটাকেও ১১ দিয়ে ভাগ দিলে মিলে যাবে।

এইভাবে সহজেই বোঝা যায়, নয় অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাটায় অঙ্কগুলো কোনো ধারাবাহিকতায় বসাতে হবে যাতে সংখ্যাটাকে ১১ দিয়ে ভাগ দিলে মিলে যায়।

আর-একটা উদাহরণ : ৩৫,২০,৪৯,৭৮৬।

এটাকে অঙ্ক কষে দেখা যাক :

৩ + ২ + ৪ + ৭ + ৬ = ২২ ৫ + ০ + ৯ + ৮ = ২২

(২২ − ২২) বিয়োগফল হল ০, তা হলে যে-সংখ্যাটা নিয়েছি আমরা তা ১১ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে।

এই সংখ্যাগুলোর ভেতর সবচেয়ে বড়টা হল–৯৮,৭৬,৫২,৪১৩।

সবচেয়ে ছোটটা–১০,২৩,৪৭,৫৮৬।

৩৫. কোনো পাঠক ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে নিচের ধরনের নয়টা উদাহরণ বের করতে পারবে। এগুলো হল :

১২ × ৪৮৩ = ৫৭৯৬
৪২ × ১৩৮ = ৫৭৯৬
১৮ × ২৯৭ = ৫৩৪৬
২৭ × ১৯৮ = ৫৩৪৬
৩৯ × ১৮৬ = ৭২৫৪
৪৮ × ১৫৯ = ৭৬৩২
২৮ × ১৫৭ = ৪৩৯৬
৪ × ১৭৩৮ = ৬৯৫২
৪ × ১৯৬৩ = ৭৮৫২

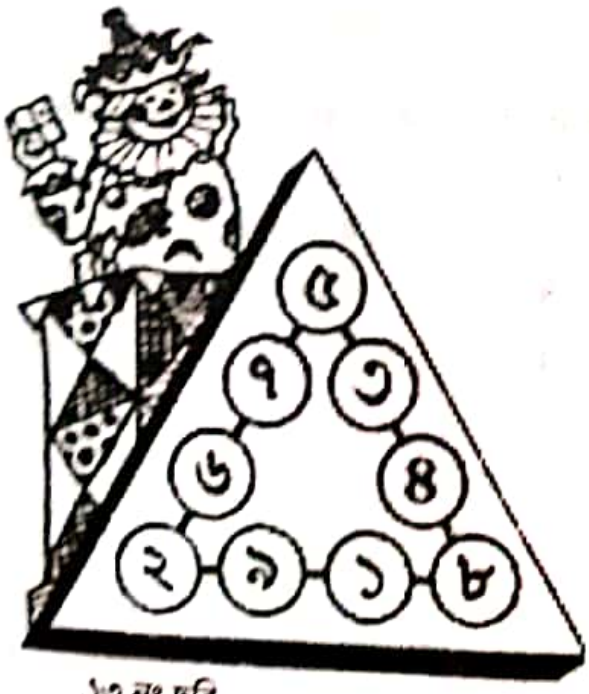

১৩ নং ছবি

১৪ নং ছবি

Scanned by CamScanner

৩৬–৩৭. ১৩ নং আর ১৪ নং ছবিতে সমাধান দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক সারির মাঝখানের অঙ্কগুলোকে জায়গা-বদল করে বসালে আর এক সারি সমাধান পাওয়া যাবে।

৪৮. কীভাবে সংখ্যাগুলো সাজাতে হবে তা দেখতে হলে নিচের মতো হিসেব ধরে নিয়ে এগোতে হবে।

মাথাগুলোতে সংখ্যার যোগফল হবে ২৬। আর তারাটার সমস্ত সংখ্যার যোগফল ৭৮।

তা হলে, ভেতরের ষড়ভুজের সংখ্যার যোগফল হবে ৭৮–২৬ = ৫২।

এবার বড় ত্রিভুজগুলির ভেতর একটা ধরা যাক। এর প্রত্যেক বাহুর সংখ্যাগুলির যোগফল ২৬। যদি তিনটে বাহুকে যোগ করা যায় তবে হবে ২৬ × ৩ = ৭৮। কিন্তু এখানে মাথাগুলির প্রত্যেকটি সংখ্যাকে গোনা হচ্ছে দু'বার করে। ভেতরের তিন জোড়ার (অর্থাৎ ভেতরের ষড়ভুজের) যোগফল আমরা জানি হবে ৫২, তা হলে প্রতিটি ত্রিভুজের মাথার যোগফলের দ্বিগুণ হবে ৭৮–৫২ = ২৬, অথবা। প্রতি ত্রিভুজে ১৩।

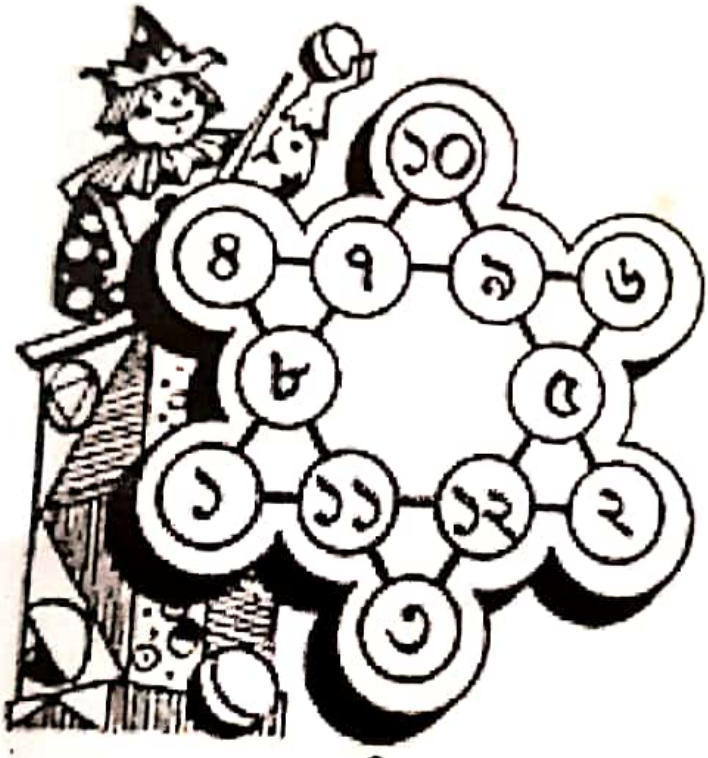

১৫ নং ছবি

এবার আমাদের অঙ্ক খুঁজে বের করার কাজটা কমে এল। উদাহরণস্বরূপ, মাথার বিন্দুগুলোতে ১২ বা ১১ কোনো সংখ্যাই থাকতে পারে না। তা হলে ১০ দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, আর এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বের হয়ে যাবে যে অন্য দুটো অঙ্ক হবে ১ আর ২।

এখন যে-কাজটা করতে হবে তা হল সংখ্যাগুলো বসিয়ে যাওয়া। তা করতে করতেই আমাদের সমাধান যেভাবে সাজাতে হবে তা বার হয়ে যাবে। ১৫ নং ছবিতে এটা দেখানো হয়েছে।

Scanned by CamScanner

৩৯. একটি লাভজনক লেনদেন

ঘটনাটা কবে বা কোথায় ঘটেছিল তা জানা নেই আমাদের। হয়তো কোনোদিনই ঘটেনি, সেটাই অবশ্য বেশি সম্ভব। কিন্তু সত্যিই হোক আর কল্পনাই হোক, এই মজার গল্পটা শোনবার মতো।

এক

এক কোটিপতি তো খুব খুশি হয়ে ঘরে ফিরল। একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তার মতে, এই দেখা হওয়াটা ভবিষ্যতে খুবই লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে।

বাড়ির লোকদের বলল সে, "কপালখানা দ্যাখো তো! লোকে যে বলে সৌভাগ্য শুধু পয়সাওয়ালা লোকদের জন্য, ঠিকই। অন্তত আমার ভাগ্যে তো কিছুটা ফলেছে কথাটা। ব্যাপারটা ঘটল একেবারে অপ্রত্যাশিত! বাড়িতে আসছি, এমন সময় দেখা হল একটা অতি সাধারণ লোকের সঙ্গে, হয়তো লক্ষই করতাম না তাকে আমি। কিন্তু আমার পয়সাকড়ি আছে শুনে সে একটা প্রস্তাব করল। আর সেই প্রস্তাবটা শুনে, বুঝলে তোমরা, আমার তো দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।

"লোকটা বলল, 'আসুন, চুক্তি করা যাক একটা, পুরো এক মাস প্রতিদিন আমি আপনাকে দেব ১ লক্ষ রুবল। এর বদলে আমারও নিশ্চয়ই চাই কিছু, অবশ্য সেটা প্রায় কিছুই না!'

"প্রথম দিন আমাকে যা দিতে হবে সে একটা তামাশামাত্র, শুধু একটা কোপেক। আমি তো আমার কানদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

"জিজ্ঞেস করলাম, 'মাত্র একটা কোপেক?'

"সে আবার বলল, 'মাত্র একটা, দ্বিতীয় দিনের ১ লক্ষ রুবলের জন্য অবশ্য দিতে হবে ২ কোপেক।'

"আমার আর তর সইছিল না, জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর, তারপর কত দিতে হবে?'

"আজ্ঞে, তৃতীয় বার ১ লক্ষ রুবলের জন্য আপনি আমাকে দেবেন ৪ কোপেক, চতুর্থবারে দেবেন ৮ কোপেক, পঞ্চম বারে ১৬ কোপেক। এইভাবে প্রতিদিন আপনি আমাকে আগের দিনের ডবল কোপেক দেবেন।'

'তারপর?'

'ব্যস, শুধু এই—এর বেশি আর কিছু চাইব না আমি। আপনি শুধু এই শর্তটাই মেনে চলবেন। প্রতিদিন আমি আপনাকে ১ লক্ষ রুবল এনে দেব, প্রতিদিন আপনি

Scanned by CamScanner

আমাদের কথামতো টাকাটা দিয়ে দেবেন। একটা শর্ত আছে শুধু, মাস শেষ না হলে কিন্তু লেনদেন বন্ধ করা চলবে না।'

"ভেবে দ্যাখো কথাটা! শুধু কয়েকটা কোপেকের জন্য লোকটা লাখ লাখ রুবল দিয়ে দিচ্ছে। লোকটা হয় জালিয়াত, নয়তো পাগল। তা যা-ই হোক, ব্যবসাটা কিন্তু লাভের। সুযোগটা তো ছাড়া চলবে না।

"আমি বললাম, 'আচ্ছা বেশ, টাকাটা নিয়ে এসো, যা চাইছ তা-ই দেব আমি। দেখো বাবা, ঠকিও না কিন্তু! জাল নোট-টোট এনো না যেন!'

"লোকটা বলল, 'ভাববেন না। কাল সকালেই আসব আমি।'

"আমার শুধু এই ভয় যে লোকটা হয়তো আসবে না। সে হয়ত বুঝতে পেরেছে যে একটা বোকার মতো কাজ করে ফেলেছে সে। আচ্ছা দেখা যাক, আগামী কালের তো দেরি নেই আর।"

দুই

পরদিন খুব ভোরেই জানালায় টোকা পড়ল। সেই অচেনা লোকটা এসেছে।

সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কোপেক ঠিক করে রেখেছেন তো, আমার কথামতো টাকাটা নিয়ে এসেছি আমি।"

সত্যিই তা-ই, ঘরে ঢুকেই একটা টাকার বান্ডিল বের করল সে। ঠিকঠিক ১ লক্ষ রুবল গুনল, তারপর বলল :

"এই হল আমাদের কথামতো টাকাটা। এখন আমার কোপেকটা দিয়ে দিন।"

টেবিলের উপর একটা তামার মুদ্রা রাখল কোটিপতি। তার হৃদয় এখন গলার কাছে ধুকপুক করছে, হঠাৎ যদি মত বদলায় লোকটার, যদি হঠাৎ ফেরত চেয়ে বসে টাকাটা! লোকটা মুদ্রাটাকে হাতের তালুতে নিয়ে ওজন করে দেখল, তারপর রেখে দিল ব্যাগের ভেতর।

"কালও এই সময়েই আসছি আমি। কোপেক দুটো তৈরি রাখতে ভুলবেন না।"

সেই ধনী লোকটি তো তার সৌভাগ্যকে বিশ্বাসই করতে পারল না। ১ লক্ষ রুবল কি আকাশের চাঁদ হাতে নিয়ে এল! টাকাটা গুনল সে, সব ঠিক আছে, কোনো জাল নোট-টোট নেই দেখে আশ্বস্ত হল। তারপর খুশিমনে টাকাটা সরিয়ে রেখে আগামী দিনের কথাটা ভাবতে লাগল।

রাতের বেলা আবার দুশ্চিন্তা শুরু হল। লোকটা যদি কোনো ছদ্মবেশী ডাকাত হয়? কোটিপতি তার ধনরত্ন কোথায় রাখে তাই দেখার জন্যই এসে থাকে যদি, হয়তো পরে ডাকাতি করবে।

ধনী লোকটি উঠে, আরও ভালো করে দরজাগুলো এঁটে দিল; বারবার জানালা খুলে দেখতে লাগল, আর একটু শব্দ হলেই ঘাবড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল, ঘুম এল না

Scanned by CamScanner

বহুক্ষণ। ভোরের বেলায় জানালায় একটা টোকা পড়ল। সেই লোকটা এসেছে। আরও ১ লক্ষ রুবল গুনে দিয়ে কথামতো দুটো কোপেক নিয়ে ব্যাগে পুরে বেরিয়ে গেল সে। বলে গেল, "কাল চার কোপেক তৈরি রাখতে ভুলবেন না।"

পকেটে আরও ১ লক্ষ রুবল এল। ধনী লোকটির তো আনন্দ আর ধরে না। এবার কিন্তু লোকটিকে আর ডাকাত বলে মনে হল না। আসলে, কোটিপতির লোকটিকে আর সন্দেহজনক বলেই মনে হল না। শুধু কয়েকটা কোপেক চায়, পাগল নাকি! আহা পৃথিবীতে যদি আরও কিছু এমন লোক থাকত, চালাক লোকেরা বেশ থাকত তা হলে...

তৃতীয় দিনেও ঠিকমতোই এল লোকটি। কোটিপতিও এবার ৪ কোপেকের বদলে পেল ১ লক্ষ রুবল।

পরদিন আরও ১ লক্ষ রুবল এল ৮ কোপেকের বদলে।

পঞ্চম বারে ১ লক্ষ রুবলের জন্য ধনী লোকটি দিল ১৬ কোপেক।

আর ষষ্ঠ বারের জন্য দিল ৩২ কোপেক।

প্রথম সাত দিনে কোটিপতি পেল ৭ লক্ষ রুবল, আর তার জন্য তার খরচা হল অতি সামান্য :

১ + ২ + ৪ + ৮ + ১৬ + ৩২ + ৬৪ = ১ রুবল ২৭ কোপেক

এটা লোভী লোকটার খুব মনোমতো হল। শর্তটা এক মাস মাত্র চলবে এই একটামাত্র দুঃখ থাকল তার। তার মানে হল মাত্র ৩০ লক্ষ রুবল পাবে সে। সময়টা অন্তত আরও ১৫ দিন বাড়াবার জন্য লোকটার সঙ্গে কথা বলবে নাকি? না বাবা, না বলাই ভালো। লোকটা হয়তো তা হলে বুঝে ফেলবে যে টাকাটা সে শুধুশুধুই দিয়ে দিচ্ছে ...

এর ভেতর সেই অচেনা লোকটা কিন্তু প্রতি সকালেই ১ লক্ষ রুবল নিয়ে আসতে লাগল। আট দিনের দিন সে পেল ১ রুবল ২৮ কোপেক, নবম দিনে–২.৫৬ রুবল, দশম দিনে–৫.১২ রুবল, এগারো দিনের দিন–১০.২৪ রুবল, বারো দিনের দিন + ২০.৪৮ রুবল, তেরো দিনের দিন–৪০.৯৬ রুবল, চোদ্দ দিনের দিন–৮১.৯২ রুবল।

ধনী লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিত টাকাটা। কমবেশি ১৫০ রুবলের বদলে সে ১৪ লক্ষ রুবল পেয়েছে।

কিন্তু তার আনন্দ স্থায়ী হল না। অল্প দিনেই সে দেখতে পেল কারবারটাকে প্রথমে সে যতটা লাভজনক ভেবেছি, ততটা নয়। ১৫ দিন বাদেই তাকে আর কোপেক নয়, কয়েক পেশা রুবল দিতে হল। তার পর থেকেই দেবার অঙ্কটা তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল। আসলে তাকে যা দিতে হল তা এই :

পনেরো বারের ১ লক্ষের জন্য ১৬৩.৮৪

ষোলো বারের ১ লক্ষের জন্য ৩২৭.৬৮

সতেরো বারের ১ লক্ষের জন্য ৬৫৫.৩৬

আঠারো বারের ১ লক্ষের জন্য ১,৩১০.৭২

উনিশ বারের ১ লক্ষের জন্য ২,৬২১.৪৪

Scanned by CamScanner

এখনও ক্ষতি হচ্ছিল না তার। ৫০০০ রুবলেরও বেশি দিতে হয়েছে তাকে সত্যি কথা, কিন্তু তার বদলে সে কি ১৮ লক্ষ রুবল পায়নি?

লাভের অঙ্কটা কিন্তু প্রতিদিনই ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছিল।

এরপর ধনী লোকটিকে যা দিতে হল তা হচ্ছে :

বিশ বারের ১ লক্ষের জন্য ৫,২৪২.৮৮
একুশ বারের ১ লক্ষের জন্য ১০,৪৮৫.৭৬
বাইশ বারের ১ লক্ষের জন্য ২০,৯৭১.৫২
তেইশ বারের ১ লক্ষের জন্য ৪১,৯৪৩.০৪
চব্বিশ বারের ১ লক্ষের জন্য ৮৩,৮৮৬.০৮
পঁচিশ বারের ১ লক্ষের জন্য ১,৬৭,৭৭২.১৬
ছাব্বিশ বারের ১ লক্ষের জন্য ৩,৩৫,৫৪৪.৩২
সাতাশ বারের ১ লক্ষের জন্য ৬,৭১,০৮৮.৬৪

এখন থেকে যে যা পাচ্ছিল তার থেকে অনেক বেশি দিতে হচ্ছিল তাকে। এখনই তার থামা দরকার। কিন্তু চুক্তি ভাঙতে পারছে না সে।

অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে লাগল। খুব দেরি করেই সেই ধনী লোকটি বুঝতে পারল যে অপরিচিত লোকটি নির্দয়ভাবে বোকা বানিয়েছে তাকে, সে যা পেয়েছে তার থেকে অনেক অনেক বেশি দিতে হবে তাকে ...

২৮ দিনের দিন ধনী লোকটিকে দশ লাখেও বেশি রুবল দিয়ে দিতে হল। তার পরের দু'বারের টাকা একেবারে পথে বসিয়ে দিল তাকে। সে একেবারে আকাশছোঁয়া টাকা :

আঠাশ বারের ১ লক্ষের জন্য ১৩,৪২,১৭৭.২৮
উনত্রিশ বারের ১ লক্ষের জন্য ২৬,৮৪,৩৫৪.৫৬
ত্রিশ বারের ১ লক্ষের জন্য ৫৩,৬৮,৭০৯.১২

আগন্তুক যখন শেষ বারের মতো চলে গেল, কোটিপতি তখন ৩০ লক্ষ রুবলের জন্য তাকে কত দিতে হয়েছে হিসেব কষতে বসল। উত্তর হল :

১,০৭,৩৭,৪১৮ রুবল ২৩ কোপেক

১ কোটি ১০ লক্ষ রুবলের অল্প কিছু কম! ... আর এর শুরু হয়েছিল এক কোপেক থেকে। অপরিচিত লোকটি যদি দৈনিক ৩ লক্ষ রুবল করেও দিত, তা হলেও তার এক কোপেকও ক্ষতি হত না।

Scanned by CamScanner

তিন

গল্পটা শেষ করার আগে কোটিপতির লোকসান আরও তাড়াতাড়ি কীভাবে হিসেব করে বের করা যায়, অর্থাৎ তার দেওয়া টাকাগুলো তাড়াতাড়ি যোগ করার উপায় দেখাব তোমাদের :

১ + ২ + ৪ + ৮ + ১৬ + ৩২ + ৬৪ ইত্যাদি

সংখ্যাগুলির নিম্নবর্ণিত বিশেষত্বগুলো লক্ষ করা কঠিন নয় মোটেই :

১ = ১
২ = ১ + ১
৪ = (১ + ২) + ১
৮ = (১ + ২ + ৪) + ১
১৬ = (১ + ২ + ৪ + ৮) + ১
৩২ = (১ + ২ + ৪ + ৮ + ১৬) + ১ ইত্যাদি

আমরা দেখছি যে প্রতিটি সংখ্যা তার আগের সংখ্যাগুলোর যোগফলের চাইতে ১ বেশি। তা হলে, যদি আমাদের সবগুলো সংখ্যা যোগ করতে হয়, যেমন ধরা যাক ১ থেকে ৩২,৭৬৮ পর্যন্ত, তখন শেষ সংখ্যার সঙ্গে (৩২,৭৬৮) আমরা যোগ করব তার আগের সংখ্যাগুলোর যোগফল। এই আগের সংখ্যাগুলোর যোগফল হল, সেই সংখ্যা থেকে ১ কম (৩২,৭৬৮ − ১)। উত্তর হল ৬৫,৫৩৫।

কোটিপতি শেষবার কত টাকা দিয়েছিল সেটা জানলে, এভাবে অঙ্ক কষেই সে মোট কত টাকা দিয়েছিল তা আমরা বের করতে পারি। সে শেষ যে-টাকাটা দিয়েছিল তা হল ৫৩,৬৮,৭০৯ রুবল ১২ কোপেক।

তা হলে ৫৩,৬৮,৭০৯.১২ আর ৫৩,৬৮,৭০৯.১১ যোগ করলেই আমাদের উত্তরটা পেয়ে যাব :

১,০৭,৩৭,৪১৮.২৩

৪০. গুজব

গুজব যে কত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কখনও একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা হয়তো চোখে দেখেছে মাত্র কয়েক জন। কিন্তু দু'ঘণ্টার ভেতরেই সেটা লোকের মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। এর অসাধারণ গতি দেখলে অবাক হতে হয়, বুদ্ধি গুলিয়ে যায়।

কিন্তু পুরো ব্যাপারটা যদি অঙ্কের সাহায্যে কষো তা হলেই দেখবে আসলে এর ভেতর চমক-লাগানো ব্যাপার কিছুই নেই, ব্যাপারটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

নিচের ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখা যাক।

Scanned by CamScanner

এক

রাজধানী থেকে একটা আগ্রহজনক খবর নিয়ে এল একজন লোক ৫০,০০০ লোক বাস করে এমন একটা শহরে। যে-বাড়িতে উঠল সেখানে তিনজন মাত্র লোককে কথাটা বলল সে। ধরো, এতে তার সময় লাগল ১৫ মিনিট।

তা হলে, লোকটি পৌঁছবার ১৫ মিনিট পরে, ধরা যাক সকাল ৮.১৫-তে, খবরটা জানল মাত্র চারজন : সে নিজে আর স্থানীয় তিনজন বাসিন্দা।

এই তিনজনের প্রত্যেকেই অন্য তিনজনকে খবরটা বলতে বেরিয়ে গেল। এতে লাগল আরও ১৫ মিনিট। তার মানেই, আধ ঘণ্টা বাদে, ৪ + (৩ × ৩) = ১৩ জন লোকের ভেতর সংবাদটা জানাজানি হল।

শেষ যে-নয়জন কথাটা জেনেছিল, তারা আবার তিনজন করে বন্ধুবান্ধবকে ঘটনাটা জানাল। সকাল ৮.৪৫ নাগাদ খবরটা জানল : ১৩ + (৩ × ৯) = ৪০ জন বাসিন্দা।

গুজবটা যদি এভাবে ছড়াতে থাকে, অর্থাৎ শোনবার ১৫ মিনিটের ভেতর প্রত্যেকেই যদি আরও তিনজনকে খবরটা বলে, তা হলে ফলটা দাঁড়াবে এই রকম :

সকাল ৯টায় খবরটা জানবে

৪০ + (৩ × ২৭) = ১২১ জন

সকাল ৯.১৫-তে খবরটা জানবে

১২১ + (৩ × ৮১) = ৩৬৪ জন

সকাল ৯.৩০-এ খবরটা জানবে

৩৬৪ + (৩ × ২৪৩) = ১০৯৩ জন

তার মানে দাঁড়াচ্ছে দেড় ঘণ্টার ভেতর খবরটা জানাজানি হবে প্রায় ১১০০ জনের ভেতর। যে-শহরে ৫০,০০০ লোকের বাস সে শহরের পক্ষে এটা অবশ্য খুব বেশি বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কি, কেউ-কেউ ভাববে যে সমস্ত শহর খবরটা জানতে অনেক সময় লাগবে। খবরটা কত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে দেখা যাক :

সকাল ৯.৪৫-তে খবরটা জানবে

১০৯৩ + (৩ × ৭২৯) = ৩২৮০ জন

সকাল ১০টায় খবরটা জানবে

৩২৮০ + (৩ × ২১৮৭) = ৯৮৪১ জন

তার পরের ১৫ মিনিটেই এটা শহরের অর্ধেকেরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছে যাবে :

৯৮৪১ + (৩ × ৬৫৬১) = ২৯,৫২৪ জন

তার মানেই হল সকাল ৮টায় যে-খবরটা জানত মাত্র একজন লোক, সকাল ১০.৩০-এর ভেতর সারা শহরের লোক তা জেনে ফেলবে।

Scanned by CamScanner

দুই

এবার দেখা যাক এটা কী করে হিসেব করা হয়। সমস্ত ব্যাপারটা নিচের এই সংখ্যাগুলির যোগ করায় এসে ঠেকছে :

১ + ৩ + (৩ × ৩) + (৩ × ৩ × ৩) + (৩ × ৩ × ৩ × ৩) + ইত্যাদি

আগে যেভাবে আমরা হিসেব করেছিলাম (১ + ২ + ৪ + ৮ ইত্যাদি) সেরূপ সহজতর পদ্ধতিতেও এটা করা যায় বোধ হয়? তা যায়, অবশ্য যে-সংখ্যাগুলি বসাচ্ছি তার কতকগুলি বিশেষত্বের দিকে লক্ষ রাখতে হবে :

১ = ১

৩ = ১ × ২ + ১

৯ = (১ + ৩) × ২ + ১

২৭ = (১ + ৩ + ৯) × ২ + ১

৮১ = (১ + ৩ + ৯ + ২৭) × ২ + ১ ইত্যাদি

তার মানেই হল, প্রতিটি সংখ্যা তার আগের সংখ্যাগুলোর যোগফলের দ্বিগুণের চাইতে ১ বেশি।

তা-হলে, ১ থেকে যে কোনো সংখ্যা পর্যন্ত যোগফল বের করতে হলে শেষের সংখ্যাটার সঙ্গে যোগ করতে হবে সেই সংখ্যার (তা থেকে ১ বিয়োগ দিয়ে নিতে হবে) অর্ধেক।

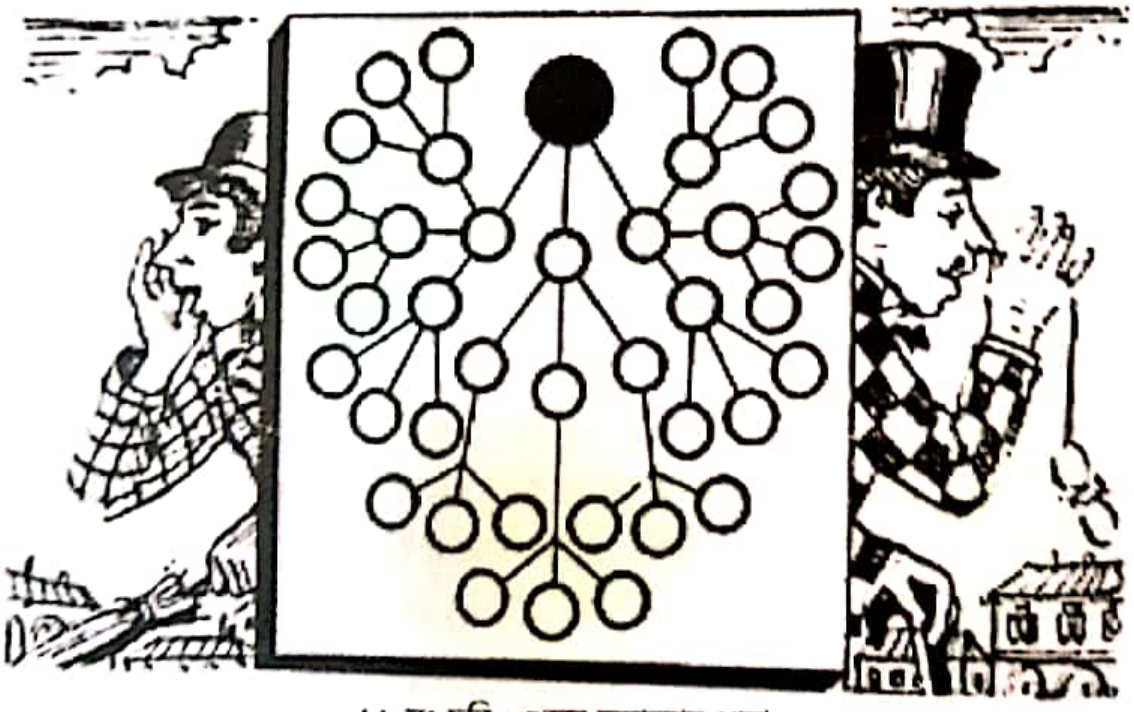

১৬ নং ছবি। তাজব ছড়ানোর ধারা

যেমন ধরা যাক, এই অঙ্কটার যোগফল কত?

১ + ৩ + ৯ + ২৭ + ৮১ + ২৪৩ + ৭২৯

অথবা ৭২৯ + ৭২৮-এর অর্ধেক, অর্থাৎ ৭২৯ + ৩৬৪ = ১০৯৩।

Scanned by CamScanner

তিন

আমাদের গল্পটায় প্রত্যেক বাসিন্দা খবরটা বলছে কেবল তিনজনের কাছে। কিন্তু শহরের বাসিন্দারা যদি একটু বেশি কথা বলে, আর খবরটা তিনজনকে না বলে পাঁচ এমনকি দশজনকে বলে, তা হলে গুজবটা ছড়াবে আরও তাড়াতাড়ি।

পাঁজন করে বললে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে :

সকাল ৮ টায়		খবরটা জানে	১ জন
সকাল ৮.১৫-তে	১ + ৫	=	৬ জন
সকাল ৮.৩০-এ	৬ +	(৫ × ৫) =	৩১ জন
সকাল ৮.৪৫-এ	৩১ +	(২৫ × ৫) =	১৫৬ জন
সকাল ৯ টায়	১৫৬ +	(১২৫ × ৫) =	৭৮১ জন
সকাল ৯.১৫-তে	৭৮১ +	(৬২৫ × ৫) =	৩৯০৬ জন
সকাল ৯.৩০-এ	৩৯০৬ +	(৩১২৫ × ৫) =	১৯,৫৩১ জন

মোদ্দা কথা, ৫০,০০০ বাসিন্দার প্রত্যেকেই সকাল ৯.৪৫-এর আগে খবরটা জেনে ফেলবে।

যদি প্রত্যেকে দশজন লোককে খবরটা বলত, তা হলে খবরটা ছড়িয়ে পড়ত আরও তাড়াতাড়ি। এক্ষেত্রে সংখ্যাটা এইভাবে তাড়াতাড়ি বেড়ে যেত :

সকাল ৮ টায়		খবরটা জানে	১ জন
সকাল ৮.১৫-তে	১ +	১০ =	১১ জন
সকাল ৮.৩০-এ	১১ +	১০০ =	১১১ জন
সকাল ৮.৪৫-এ	১১১ +	১,০০০ =	১,১১১ জন
সকাল ৯ টায়	১,১১১ +	১০,০০০ =	১১,১১১ জন

এর পরের সংখ্যাটা নিশ্চয়ই হবে ১,১১,১১১। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে সকাল ৯টার কিছু পরেই সারা শহর খবরটা জেনে যাবে। এক্ষেত্রে খবরটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে এক ঘণ্টার কিছু বেশি লাগবে।

৪১. সাইকেলের জুয়াচুরি

প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় এবং বিদেশে হয়তো বর্তমানেও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান সাধারণ স্তরের মালপত্তর কাটাবার জন্য এক নতুন ধরনের পথ বের করে। জনপ্রিয় সংবাদপত্র বা পত্রিকাগুলোতে নিচের ধরনের একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হত :

টোপটা অনেকেই গিলল, তারা লিখে পাঠাল নিয়মাবলির জন্য। তাদের কাছে এল এক বিস্তৃত তালিকা।

১০ রুবলের বদলে তারা যা পেল তা কিন্তু সাইকেল নয়। তারা পেল চারটে কুপন, এগুলোকে আবার ১০ রুবল দামে তাদের বন্ধুদের কাছে বেচতে বলা হল। এভাবে যে ৪০ রুবল আদায় হল, সে তা পাঠিয়ে দিল সেই প্রতিষ্ঠানকে। তখন প্রতিষ্ঠানটি তাকে পাঠাল সাইকেলটা। সে তা হলে সত্যিসত্যিই ১০ রুবল দিল। বাকি ৪০ রুবল এল তার

Scanned by CamScanner

বন্ধুদের পকেট থেকে। আসলে এই ১০ রুবল দেওয়া ছাড়াও খদ্দেরকে বাকি চারটে কুপন কেনার লোক জোগাড় করতে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হল। অবশ্য তাতে তার পয়সা খরচা কিছু হল না।

এই কুপনগুলি কী? খদ্দের তার ১০ রুবলের জন্য কী কী সুবিধা পেল? সে একই ধরনের পাঁচটা কুপনের সঙ্গে তার কুপনটা বদলে নেবার অধিকারটাকে কিনে নিয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে সে সাইকেলের দাম ৫০ রুবল আদায় করার সুযোগের দাম দিয়েছিল। এই সাইকেলটা কিনতে তার আসলে লাগল কুপনের টাকাটা, মাত্র ১০ রুবল। নতুন করে যারা কুপনের মালিক হল তারা আবার প্রত্যেকে বিলি করার জন্য পেল পাঁচটা কুপন, এভাবে চলল।

একবার দেখলে সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর কোনো জুয়াচুরি আছে বলে মনে হবে না। বিজ্ঞাপনদাতা তার কথা রাখল। সাইকেলটা কিনতে খদ্দেরকে আসলে ১০ রুবলই দিতে হল। প্রতিষ্ঠানটিরও কিছু ক্ষতি হচ্ছিল না, মালের পুরো দামটাই তারা পেয়ে যাচ্ছিল।

তবু ব্যাপারটা ছিল পরিষ্কার জুয়াচুরি। কারণ বহু লোক তাদের শেষ কুপনগুলি বেচতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত হল। তাই রাশিয়ায় এর নাম হল 'ধস'। কোম্পানির লাভের টাকাটা এদের কাছ থেকেই জুটছিল। দু'দিন আগে বা পরে এমন একটা অবস্থা এল যে কুপনের মালিকদের পক্ষে ওগুলো বিক্রি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কুপনের মালিকের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছিল। কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসেব কষতে বসলেই ঘটনাটার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখা যাবে।

প্রথম কিস্তিতে যারা সরাসরি প্রতিষ্ঠানটি থেকেই কুপন কিনেছিল, কেনবার নতুন লোক জোগাড় করতে কোনো মুশকিলই হল না তাদের। এই দলের প্রত্যেকে লেনদেনটার ভেতর চারজন করে নতুন লোক নিয়ে এল। এদের আবার কুপনগুলি বিক্রি করতে হল ২০ জনের (৪ × ৫) ভেতর, আর তা করতে গিয়ে তাদের এই কুপন কেনার সুবিধা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাতে হল। ধরে নেওয়া যাক তারা তা পারল, তখন কুড়ি জন নতুন করে অংশগ্রহণ করল এতে।

বরফের ধসটার গতি আর পরিধি (ভর, বেগ) দুইই বেড়ে উঠল। কুপনের ২০ জন নতুন মালিককে কুপনগুলো ছড়িয়ে দিতে হল আরও ২০ × ৫ = ১০০ জনের ভেতর।

এই পর্যন্ত সর্বপ্রথমে যারা কুপন পেয়েছিল তারা প্রত্যেকে খেলার ভেতর টেনে এনেছে ১ + ৪ + ২০ + ১০০ = ১২৫ জন লোককে। এদের ভেতর ২৫ জন সাইকেল পেয়েছে। বাকি ১০০ জনকে একটি করে সাইকেল পাবার আশা দেওয়া হয়েছে, আর এই আশাতেই তারা প্রত্যেকে দিয়েছে ১০ রুবল করে।

'ধস' এবার বন্ধুবান্ধবদের ছোট পরিধি ভেদ করে ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে, সেখানে কেনবার নতুন লোক খুঁজে পাওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। শেষ যে ১০০ জন কুপন কিনল তাদের আবার বিক্রি করতে হল ৫০০ জন নতুন শিকারের কাছে। তাদের আবার টানতে হল আরও ২৫০০ জনকে। শহরটা একেবারে কুপনে ছেয়ে যেতে লাগল, আর সত্যি বলতে কি, কুপন কিনতে চায় এমন লোক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল।

Scanned by CamScanner

তোমরা দেখতে পাবে যে এই 'লাভের ব্যবসাতে' যাদের টানা হল তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল গুজব যেভাবে ছড়িয়েছিল (আগে দ্যাখো) ঠিক সেভাবে। যে-সংখ্যাগুলো পাওয়া গেল তা পিরামিডের মতো করে সাজালে দাঁড়ায় :

১
৪
২০
১০০
৫০০
২৫০০
১২,৫০০
৬২,৫০০

শহরটা যদি বড় হয় আর সাইকেল-চড়া লোকের সংখ্যা হয় ৬২,৫০০ তা হলে ৮ কিস্তিতেই 'বরফ ধসে' পড়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এই সময়ের ভেতর সমস্ত লোকই পরিকল্পনার আওতায় এসে গেছে। কিন্তু এদের মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগই সাইকেল পাবে। বাকি লোকদের কাছে থাকবে কুপন। সে-কুপনগুলো বিক্রির সম্ভাবনা আর এ-জন্যে হবে না।

আরও বেশি লোকসংখ্যা যেসব শহরে, এমনকি যে-আধুনিক রাজধানীতে লোক থাকে লক্ষ লক্ষ সেখানেও আর কয়েকটি কিস্তিতেই খেল খতম হয়ে যাচ্ছে। কারণ সংখ্যার এই পিরামিড বেড়ে উঠেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। নবম কিস্তির পর থেকে সংখ্যাগুলো এইরকম দাঁড়াচ্ছে :

৩,১২,৫০০
১৫,৬২,৫০০
৭৮,১২,৫০০
৩,৯০,৬২,৫০০

তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে ১২ নম্বর কিস্তিতে এই পরিকল্পনাটা একটা দেশের সমস্ত অধিবাসীকে গ্রাস করে ফেলবে, আর এই জাল কারবারিদের হাতে ঠকে যাবে তাদের $\frac{৪}{৫}$ ভাগ।

তাদের লাভটা কী হল দেখা যাক। তারা জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ক্রেতার জন্য বাকি পাঁচ ভাগের চার ভাগকে দাম দিতে বাধ্য করছে। তার মানে : এই দল হয়েছে অন্য দলের সুখের জোগানদার। তা ছাড়াও তারা পাচ্ছে অত্যুৎসাহী একদল মালবিক্রেতা, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেতেই কাজে এসেছে তারা। সমস্ত ঘটনাটাকে একজন রুশ লেখক ঠিকই নাম দিয়েছিলেন 'পারস্পরিক জুয়াচুরির হিমানীপ্রপাত'। ঘটনাটি সম্বন্ধে আর যা বলা যেতে পারে তা হল : কী করে হিসেব কষে জুয়াচুরি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে হয়, তা যারা জানত না, তারাই ভুগত।

Scanned by CamScanner

পুরনো রোমের সেই উপকথার ঘটনাটা বলছি এখানে।*

এক

রোমান সেনাপতি তেরেনতিয়াস এক বিজয় অভিযান থেকে অনেক ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরে একবার সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

সম্রাটও তাঁকে খুব সমাদর করে গ্রহণ করে সাম্রাজ্যের জন্যে তিনি যা করেছেন সেজন্যে ধন্যবাদ জানালেন এবং সিনেটে তাঁর সম্মানের উপযুক্ত একটি পদ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিন্তু তেরেনতিয়াস এই পুরস্কার চাননি।

তিনি বললেন, "আপনার সুনাম আর ক্ষমতা বিস্তারের জন্যে আমি অনেক যুদ্ধ জয় করেছি, মৃত্যুকেও আমি ভয় করিনি। যদি আমার একাধিক প্রাণ থাকত তাহলে তাও আপনার জন্যে স্বেচ্ছায় আমি উৎসর্গ করতাম। কিন্তু যুদ্ধ করে করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সে বয়স এখন আমার আর নেই, শিরার রক্তেও আর তেজ নেই। এখন আমার পৈত্রিক বাড়িতে ফিরে গিয়ে জীবন কাটাবার সময় হয়েছে।"

"তেরেনতিয়াস, বলো, কী তুমি চাও?" সম্রাট প্রশ্ন করলেন।

"হে সম্রাট! আমি চাই আপনার অনুগ্রহ। প্রায় সারা জীবনই আমি যুদ্ধে কাটিয়েছি, রক্তরঞ্জিত করেছি আমার তরবারি, কিন্তু নিজের সৌভাগ্য গড়ার কোনো সময়ই আমি পাইনি। আমি দরিদ্র..."

"সাহসী তেরেনতিয়াস, বলো, বলো!" সম্রাট বলে উঠলেন।

উৎসাহ পেয়ে সেনাপতি বললেন, "আপনার অনুচরকে যদি পুরস্কারই দেবেন, তাহলে অনুগ্রহ করে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন শান্তি ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে সাহায্য করুন। আমি সম্মান চাই না, চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী সিনেটেও কোনো উঁচু পদের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। ক্ষমতা এবং সমাজ থেকে সরে গিয়ে আমি শান্তিতে বসবাস করতে চাই। হে সম্রাট, জীবনের বাকি দিনগুলো সুখে কাটাবার উপযুক্ত অর্থ আমাকে দিন।"

গল্পে আছে, সম্রাট দয়ালু ছিলেন না। আসলে, তিনি ছিলেন কৃপণ। টাকা দিতে প্রাণে লাগে তাঁর। সেনাপতিকে উত্তর দেবার আগে একমুহূর্ত ভেবে নিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি জিজ্ঞেস করলেন :

"কত টাকা হলে চলবে বলে মনে করো?"

---

* ব্রিটেনের এক ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সংগ্রহভুক্ত হাতে-লেখা ল্যাটিন পাণ্ডুলিপির অনুবাদ।

Scanned by CamScanner

"হে সম্রাট, দশ লক্ষ দিনারি (স্বর্ণমুদ্রা)।"

সম্রাট আবার চুপ হয়ে গেলেন। সেনাপতি মাথা নিচু করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত সম্রাট বললেন :

"সাহসী তেরেনতিয়াস, তুমি একজন বিরাট সেনাপতি। সত্যিসত্যিই তোমার কীর্তির উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া উচিত। ধনদৌলত আমি দেব তোমাকে। আমি যা ঠিক করি কাল দুপুরে জানতে পাবে।"

নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন তেরেনতিয়াস।

দুই

পরদিন রাজপ্রাসাদে এলেন তেরেনতিয়াস।

"এই যে সাহসী তেরেনতিয়াস!" সম্রাট আহ্বান জানালেন।

শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথা নোয়ালেন সেনাপতি।

"সম্রাট, আমি আপনার মতামত জানতে এসেছি, আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পুরস্কার দেবেন কথা দিয়েছেন।"

সম্রাট উত্তর দিলন, "নিশ্চয়ই, তোমার মতো একজন মহান যোদ্ধাকে আমি সামান্য কোনো প্রতিদান দিতে চাই না। দেখো, আমার ধনাগারে ৫০ লক্ষ পেতলের মুদ্রা আছে, যার দাম হলো দশ লক্ষ দিনারি। এবার খেয়াল করে শোনো। তুমি আমার ধনাগারে গিয়ে একটা মুদ্রা এখানে নিয়ে আসবে। পরদিন আবার ধনাগারে গিয়ে প্রথমটার দ্বিগুণ দামের মুদ্রা এনে প্রথমটার পাশে রাখবে। তৃতীয় দিনে পাবে প্রথমটার চার গুণ, চতুর্থ দিনে আট গুণ, পঞ্চম দিনে ষোলো গুণ এক একটা করে মুদ্রা। এইভাবেই চলতে থাকবে। তোমার জন্যে প্রতিদিন উপযুক্ত দামের মুদ্রা তৈরির আদেশ দিয়ে রাখব। যতদিন পর্যন্ত ক্ষমতা থাকবে তোমার, তুমি আমার কোষাগার থেকে মুদ্রা নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু কারুর সাহায্য না নিয়ে কাজটা একাই করতে হবে তোমাকে। আর যখন তুমি আর মুদ্রা তুলতে পারবে না, তখন থামবে। আমাদের চুক্তি শেষ হবে তখন। যা কিছু মুদ্রা তুমি নিয়ে আসবে, তাই হবে তোমার পুরস্কার।"

খুব আগ্রহ নিয়ে সম্রাটের কথা শুনলেন তেরেনতিয়াস। রাজকোষ থেকে "বিরাট ধন নিয়ে আসার কল্পনায় তাঁর চোখ তখন স্বপ্নিল।

"হে সম্রাট, আপনার বদান্যতায় আমি কৃতজ্ঞ। আপনার পুরস্কার সত্যিই অপূর্ব!"

সানন্দে উত্তর দিলেন তেরেনতিয়াস।

Scanned by CamScanner

সম্রাটের দরবার-ঘরের কাছেই কোষাগার। এভাবে প্রতিদিন সেখানে যেতে শুরু করলেন তেরেনতিয়াস। প্রথম মুদ্রাকে দরবার-ঘরে নিয়ে আসা কঠিন হলো না।

প্রথম দিন যে ছোট্ট মুদ্রাটি তেরেনতিয়াস নিয়ে এলেন তার ব্যাস হলো ১১ মিলিমিটার আর ওজন ৫ গ্রাম।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম আর ষষ্ঠ মুদ্রাগুলো বয়ে নিয়ে আসাও বেশ সহজ হলো। ওগুলোর ওজন ছিল যথাক্রমে ১০, ২০, ৪০, ৮০ আর ১৬০ গ্রাম।

সপ্তম মুদ্রার ওজন হলো ৩২০ গ্রাম আর তার ব্যাস হলো ৮.৫০ সেন্টিমিটার (অথবা ঠিক ঠিক বলতে গেলে ৮৪ মিলিমিটার*)।

অষ্টম দিনে তেরেনতিয়াসকে যে মুদ্রাটা নিতে হলো তার দাম ছিল প্রথম মুদ্রার ১২৮ গুণ, এর ওজন হলো ৬৪০ গ্রাম, আর ব্যাস হলো প্রায় ১০ সেন্টিমিটার।

নবম দিনে তিনি সম্রাটের কাছে যে মুদ্রাটা নিয়ে এলেন তার দাম হলো প্রথম মুদ্রার ২৫৬ গুণ, ওজন হলো ১.২৫০ কিলোগ্রামেরও বেশি আর ব্যাস হলো ১৩ সেন্টিমিটার।

বারো দিনের মুদ্রাটার ব্যাস হলো প্রায় ২৭ সেন্টিমিটার, আর ওজন দাঁড়াল ১০.২৫০ কিলোগ্রাম।

সম্রাট প্রতিদিন সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন তেরেনতিয়াসকে। জয়ের আনন্দ আর লুকিয়ে রাখতে পারলেন না তিনি। তিনি দেখলেন যে, তেরেনতিয়াস তাঁর কোষাগারে গিয়েছেন ১২ বার, আর এনেছেন ২০০০ পেতলের মুদ্রার কিছু বেশি মাত্র।

তেরো দিনের দিন তেরেনতিয়াস পেলেন প্রথম মুদ্রাটা থেকে ৪.৯৬ গুণ দামি মুদ্রা। এর ব্যাস ছিল ৩৪ সেন্টিমিটার আর ওজন ২০.৫০০ কিলোগ্রাম।

এর পরদিনের মুদ্রাটা হলো আরও বড় আর আরও ভারী : ওজন হলো ৪১ কিলোগ্রাম, ব্যাস হলো ৪২ সেন্টিমিটার।

হাসি না-চাপতে-পেরে সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, "সাহসী তেরেনতিয়াস, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ কি?"

"না সম্রাট", ভুরু কুঁচকে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে উত্তর করলেন সেনাপতি। পার হয়ে এলো পনেরো দিন। বোঝাটা এত ভারী হয়নি আর কখনও। প্রথম মুদ্রাটা থেকে ১৬,৩৮৪ গুণ দামি একটা মুদ্রা বয়ে নিয়ে তেরেনতিয়াস ধীরে ধীরে এসে ঢুকলেন দরবারে। এর ব্যাস ছিল ৫৩ সেন্টিমিটার আর ওজন ৮০ কিলোগ্রাম। ওজনটা একজন দীর্ঘকায় যোদ্ধার ওজনের সমান।

---

* প্রথম মুদ্রা থেকে ব্যাস আর পুরুত্বে চার গুণ বেশি হলেই মুদ্রাটা ৬৪ গুণ ভারী হয়ে যায়, কারণ ৪ × ৪ × ৪ = ৬৪ গল্পের শেষে যখন আমরা মুদ্রার আকার হিসেব করব তখন কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে।

Scanned by CamScanner

ষোলো দিনের দিন বোঝাটা বয়ে আনতে গিয়ে সেনাপতির পা কাঁপতে লাগল। মুদ্রাটার দাম ছিল ৩২,৭৬৮টা মূল মুদ্রার সমান, আর ওজন হলো ১৬৪ কিলোগ্রাম। ব্যাস দাঁড়াল ৬৭ সেন্টিমিটার।

হাঁপাতে হাঁপাতে তেরেনেতিয়াস এসে ঢুকলেন দরবার-ঘরে। তাঁকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সম্রাটের সঙ্গে দেখা হলে সম্রাট একটু হেসে তাঁর দিকে তাকালেন ..... এর পরদিন সেনাপতি সেখানে আসতেই এক দমকা হাসি অভ্যর্থনা জানাল তাঁকে। মুদ্রাটা আর বয়ে আনতে পারেননি তিনি, গড়িয়ে আনতে হয়েছে। এর ব্যাস ছিল ৮৪ সেন্টিমিটার, ওজন ৩২৮ কিলোগ্রাম আর দাম ৬৫,৫৩৬টি মূল মুদ্রার সমান।

আঠারো দিনটাতেই শেষবারের মতো কিছু ধনসম্পদ বাগাতে পারলেন তিনি। রাজকোষ হয়ে দরবারে যাওয়া শেষ হয়ে গেল তাঁর। এবারের মুদ্রাটার দাম ছিল ১,৩১,০৭২টি মূল মুদ্রার সমান, ব্যাস ১ মিটারেরও বেশি, আর ওজন ৬৫৫ কিলোগ্রাম। তাঁর বর্শাটাকে স্টিয়ারিং-লিভারের মতো করে ধরে মুদ্রাটা গড়িয়ে আনলেন তিনি। সম্রাটের পায়ের কাছে ধপাস করে পড়ল সেটা।

একেবারে দম ফুরিয়ে গেছে তেরেনতিয়াসের।

"যথেষ্ট... হয়েছে," হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি।

আনন্দের হাসি অতিকষ্টে চাপলেন সম্রাট। সেনাপতিকে একেবারে বোকা বানিয়েছেন তিনি। কোষাধ্যক্ষকে এরপর হিসেব করতে বললেন তিনি : তেরেনতিয়াস রাজকোষ থেকে কত টাকা বের করে এনেছেন।

তাই করলেন কোষাধ্যক্ষ।

"হে সম্রাট, আপনার সহৃদয়তাকে ধন্যবাদ। সাহসী তেরেনতিয়াস পুরস্কার পেয়েছেন ২,৬২,১৪৩টি পেতলের মুদ্রা।"

এভাবে সেই কৃপণ সম্রাট, সেনাপতি যে দশ লক্ষ দিনার চেয়েছিলেন তার মাত্র কুড়ি ভাগের এক ভাগ দিলেন তাঁকে।

কোষাধ্যক্ষের হিসেব আর মুদ্রাগুলোর ওজন দেখা যাক এবার। রাজকোষ থেকে তেরেনতিয়াস যা নিয়েছিলেন তা হলো :

১ম দিনে	১টির	সমান মুদ্রার ওজন	৫ গ্রাম
২য় দিনে	২টির	সমান মুদ্রার ওজন	১০ গ্রাম
৩য় দিনে	৪টির	সমান মুদ্রার ওজন	২০ গ্রাম
৪র্থ দিনে	৮টির	সমান মুদ্রার ওজন	৪০ গ্রাম
৫ম দিনে	১৬টির	সমান মুদ্রার ওজন	৮০ গ্রাম
৬ষ্ঠ দিনে	৩২টির	সমান মুদ্রার ওজন	১৬০ গ্রাম

Scanned by CamScanner

৭ম দিনে	৬৪টির	সমান মুদ্রার ওজন	৩২০ গ্রাম
৮ম দিনে	১২৮টির	সমান মুদ্রার ওজন	৬৪০ গ্রাম
৯ম দিনে	২৫৬টির	সমান মুদ্রার ওজন	১,২৮০ গ্রাম
১০ম দিনে	৫১২টির	সমান মুদ্রার ওজন	২,৫৬০ গ্রাম
১১শ দিনে	১,০২৪টির	সমান মুদ্রার ওজন	৫,১২০ গ্রাম
১২শ দিনে	২,০৪৮টির	সমান মুদ্রার ওজন	১০,২৪০ গ্রাম
১৩শ দিনে	৪,০৯৬টির	সমান মুদ্রার ওজন	২০,৪৮০ গ্রাম
১৪শ দিনে	৮,১৯২টির	সমান মুদ্রার ওজন	৪০,৯৬০ গ্রাম
১৫শ দিনে	১৬,৩৮৪টির	সমান মুদ্রার ওজন	৮১,৯২০ গ্রাম
১৬শ দিনে	৩২,৭৬৮টির	সমান মুদ্রার ওজন	১,৬৩,৮৪০ গ্রাম
১৭শ দিনে	৬৫,৫৩৬টির	সমান মুদ্রার ওজন	৩,২৭,৬৮০ গ্রাম
১৮শ দিনে	১,৩১,০৭২টির	সমান মুদ্রার ওজন	৬,৫৫,৩৬০ গ্রাম

দ্বিতীয় কলামের সংখ্যাগুলোকে খুব সহজেই যোগ করে ফেলতে জানি আমরা। যোগফলটা এখানে হচ্ছে ২,৬২,১৪৩। তেরেনতিয়াস কিন্তু চেয়েছিলেন ১০ লক্ষ দিনারি, অর্থাৎ ৫০ লক্ষ পেতলের মুদ্রা। তাহলে তিনি পেলেন—

৫০,০০,০০০:২,৬২,১৪৩ = ১৯ ভাগ

৪৩. দাবাখেলার কাহিনী

দাবাখেলা—পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো খেলার একটা। খেলাটা আবিষ্কার হয়েছে বহু বহু শতাব্দী আগে। সুতরাং এর সম্বন্ধে যে অনেক কাহিনী থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী। আর কাহিনীগুলোর বেলায় যা হয়, সেগুলোর সত্যি-মিথ্যা জানা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এগুলোর একটা বলছি তোমাদের। গল্পটা বুঝতে অবশ্য দাবা খেলতে জানা দরকার নেই : একটা ছক-কাটা বোর্ডে ৬৪টা খোপ থাকে, এটুকু জানলেই চলবে।

এক

বলা হয়ে থাকে, দাবাখেলাটা এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। একটা খেলায় যে কত রকম বুদ্ধির চাল দেয়া যায় তা দেখে রাজা শেরাম খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

এর উদ্ভাবক তাঁরই একজন প্রজা জানতে পেরে, এই অপূর্ব আবিষ্কারের জন্যে পুরস্কার দেবেন ঠিক করে রাজা শেরাম তাঁকে তাঁর সামনে হাজির করতে আদেশ করলেন।

খুব সাদাসিধে পোশাক পরা এই লোকটির নাম ছিল সেসা। শিক্ষকতা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি। সেসা এসে উপস্থিত হলেন রাজার সামনে।

Scanned by CamScanner

রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "আপনার অদ্ভুত আবিষ্কারের জন্যে পুরস্কার দিতে চাই আপনাকে।"

সেসা মাথা নুইয়ে নমস্কার জানালেন।

রাজা বললেন, "আপনার মনের যে কোনো কামনা পূর্ণ করার মতো ধনসম্পদ আমার আছে। কী চাই আপনার তাই শুধু বলুন, তাই দেব আপনাকে।"

সেসা নীরব রইলেন।

রাজা উৎসাহ দিয়ে বললেন, "লজ্জার কী আছে? বলুন না কী চাই আপনার। আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে কোনো ত্রুটিই হবে না।"

পণ্ডিত উত্তর করলেন, "মহারাজ, আপনার দয়ার সীমা নেই, কিন্তু একটু ভাবতে সময় দিন আমাকে। ভালোভাবে চিন্তা করে কাল আমার প্রার্থনা জানাব আপনাকে।"

পরদিন অতি তুচ্ছ এক অনুরোধ জানিয়ে রাজাকে আশ্চর্য করে দিলেন সেসা।

তিনি বললেন, "প্রভু দাবার ছকের প্রথম ছকটার জন্যে এক দানা গম পেতে চাই আমি।"

"সাধারণ এক দানা গম?" রাজা যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

"হ্যাঁ প্রভু, দ্বিতীয়টার জন্যে দুটো, তৃতীয়টার জন্যে চারটে, চতুর্থটার জন্যে আটটা, পঞ্চমটার জন্যে ১৬টা, ষষ্ঠটার জন্যে ৩২টা..."

বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন রাজা, "আচ্ছা, আচ্ছা, দাবার ৬৪টা ছকের জন্যেই আপনার ইচ্ছেমতো গমের দানা পাবেন আপনি। প্রতিদিন তার আগের দিনের চাইতে দ্বিগুণ, এই তো। কিন্তু জেনে রাখুন আপনার প্রার্থনাটা ঠিক আমার দেবার ইচ্ছের উপযুক্ত হলো না। এই রকম একটা নগণ্য পুরস্কার প্রার্থনা করে আপনি আমাকে অসম্মান করলেন। সত্যি বলতে কি, একজন শিক্ষক হিসেবে রাজার উদারতাকে আরও একটু বেশি সম্মান দেখাতে পারতেন আপনি। আপনি যান! আমার ভৃত্যরা আপনার গমের থলি পৌঁছে দেবে।"

হেসে বেরিয়ে গেলেন সেসা। তারপর তোরণের কাছে তাঁর পুরস্কারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দুই

খাবার সময় সেসার কথা মনে পড়ল রাজার। সেই 'বেকুব' আবিষ্কারক তার নগণ্য পুরস্কার পেয়ে গেছে কি-না জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

তাঁকে জানানো হলো, "প্রভু! আপনার আদেশ পালন করা হচ্ছে। কতগুলো গমের দানা তিনি পাবেন, তা পণ্ডিতরা হিসেব করছেন।"

রাজা ভুরু কোঁচকালেন। এত ধীরে ধীরে তাঁর আদেশ পালন করা হচ্ছে, এতে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি।

Scanned by CamScanner

রাতে শোবার আগে আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি, সেসাকে তাঁর গমের থলিটা দেয়া হয়েছে কি-না।

উত্তর শুনলেন, "প্রভু আপনার হিসেবনবিসরা হিসাব করে চলেছেন একটানা, তাঁরা আশা করছেন সকালের আগেই হিসেবটা শেষ হবে।"

রেগে উঠে প্রশ্ন করলেন রাজা, "এরা এত দেরি করছে কেন? আমার ঘুম ভাঙবার আগেই সেসাকে যেন কড়ায় ক্রান্তিতে সব শোধ করে দেয়া হয়। একটা দানাও যেন বাকি না থাকে। আমি দু'বার আদেশ দিই না!"

সকালবেলায় রাজাকে বলা হলো, রাজসভার প্রধান হিসেবনবিস দেখা করতে চেয়েছেন।

রাজা তাঁকে আসতে আদেশ করলেন।

রাজা শেষাম প্রশ্ন করলেন তাঁকে, "আপনার কথা শোনবার আগে, সেসাকে তাঁর প্রার্থনামতো নগণ্য পুরস্কার দেয়া হয়েছে কি-না, সেটাই জানতে চাই।"

বুড়ো পণ্ডিত উত্তর করলেন, " সেজন্যেই তো এত ভোরে আপনার সামনে আসতে সাহস করেছি। সেসার প্রার্থনামতো গমের দানার সংখ্যাটা বের করতে একটানা খেটেছি আমরা। সে একটা বিরাট..."

অধৈর্য হয়ে তাঁকে বাধা দিলেন রাজা, "হিসেবটা যত বিরাটই হোক না কেন, আমার শস্যের গোলাগুলো থেকে সহজেই তা দেয়া যাবে। তাঁকে এই পুরস্কার দেব কথা দিয়েছি। আর তা দিতেই হবে....."

"মহারাজ, সেসার প্রার্থনা পূর্ণ করা আপনার ক্ষমতার বাইরে। সেসা যা চেয়েছেন তত দানা আপনার গোলায় নেই। আপনার সমস্ত রাজ্যেও ততটা দানা নেই। সত্যি বলতে কি সারা পৃথিবীতেও নেই। যদি আপনার কথা রাখতেই হয় তাহলে সমস্ত সাগর ও মহাসাগরের জল ছেঁচে, উত্তরের মরুভূমিগুলোর তুষার আর বরফ গলিয়ে ফেলে সারা পৃথিবীর সমস্ত জমিতে গমের চাষ করতে আদেশ করুন। যদি এই সমস্তটা জমিতেই গমের আবাদ করা যায় তাহলে হয়তো সেসাকে দেবার মতো গমের দানা পাওয়া যাবে।"

অবাক বিস্ময়ে পণ্ডিতের কথা শুনছিলেন রাজা।

"কত দানা?" চিন্তান্বিতভাবে বললেন তিনি।

পণ্ডিত উত্তর করলেন, "মহারাজ, সংখ্যাটা ১,৮৪,৪৬, ৪০,৭৩,৭০, ৯৫,৫১,৬১৫!"

Scanned by CamScanner

তিন

গল্পটা হলো এই। সত্যিই এ রকম ঘটেছিল কি-না তা আমরা জানি না। কিন্তু পুরস্কারটা যে এই রকমই একটা সংখ্যায় দাঁড়াবে তা বোঝা কিছু কঠিন নয়। একটু ধৈর্য ধরে আমরাই হিসেবটা কষে ফেলতে পারি।

১ থেকে শুরু করো ১, ২, ৪, ৮ ইত্যাদি সংখ্যাগুলো যোগ করতে হবে। ২-এর ৬৩তম ঘাত যত সেটাই হলো ৬৪তম ছকের জন্যে আবিষ্কারকের প্রাপ্যের সমান। $২^{৬৪}$-এর থেকে ১ বিয়োগ করলেই খুব সহজে শস্যদানার সংখ্যাটা পেয়ে যাব আমরা। এর অর্থ হলো ২কে ২ দিয়ে ৬৪ বার গুণ করতে হবে :

২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ইত্যাদি ৬৪ বার।

হিসেবের সুবিধার জন্যে এই ৬৪টি উৎপাদকে আমরা ৬টা ভাগে ভাগ করব, প্রতি ভাগে থাকবে ১০টা করে ২, সবচেয়ে শেষের ভাগে থাকবে ৪টা ২। $২^{১০}$-এর ফল হলো ১০২৪ আর $২^{৪}$ হলো ১৬। তাহলে যে উত্তরটা আমরা চাই তা দাঁড়াচ্ছে :

১০২৪ × ১০২৪ × ১০২৪ × ১০২৪ × ১০২৪ × ১০২৪ × ১৬

১০২৪-কে ১০২৪ দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই ১০,৪৮,৫৭৬। এখন আমাদের বের করতে হবে।

১০,৪৮,৫৭৬ × ১০,৪৮,৫৭৬ × ১০,৪৮,৫৭৬ × ১৬

এর থেকে ১ বিয়োগ করলেই শস্যের এই সংখ্যাটা পেয়ে যাব আমরা :

১,৮৪,৪৬,৭৪,৪০,৭৩,৭০,৯৫,৫১,৬১৫

এই বিরাট সংখ্যাটা সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণা করতে হলে ভেবে দেখো শস্যগুলো রাখতে কত বড় গোলার দরকার হবে? আমরা জানি যে এক ঘন মিটার গমের ভেতর থাকে ১,৫০,০০,০০০ দানা। তাহলে দাবাখেলা যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর ইচ্ছেমতো পুরস্কারটা রাখতে হলে, ১,২০,০০,০০,০০,০০,০০০ ঘন মিটার বা ১২,০০০ ঘন কিলোমিটারের কাছাকাছি আয়তনের গোলা দরকার। যদি এমন একটা গোলাঘর হয় যা ৪ মিটার উঁচু আর পাশে ১০ মিটার, তাহলে এর দৈর্ঘ্য হবে ৩০ কোটি কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব তার দ্বিগুণ।

রাজা সেসার প্রার্থনা রাখতে পারলেন না। কিন্তু অঙ্কে একটু মাথা থাকলেই তিনি এমন বিরাট পুরস্কার দেয়াটাকে এড়িয়ে যেতে পারতেন। সেসাকেই একটি একটি করে দানা গুণে নিয়ে যেতে বললেই চলত। সত্যিই সেসা যদি সারা দিনরাত্রি একেবারে না থেমে শস্যের দানা গুণে যেতেন, প্রতিটি দানা গুনতে যদি তাঁর সময় লাগত এক সেকেন্ড, তাহলে প্রথম দিনে তিনি গুনতেন ৮৬,৪০০টা দানা, দশ লক্ষ শস্যদানা ১০ দিনের কমে গুনতে পারতেন না। এক ঘন মিটারে যতটা গম ধরে তা গুনতে তাঁর লাগত

Scanned by CamScanner

প্রায় ছয় মাস। একবারও না থেমে ১০ বছর ধরে গুনে গেলে তিনি ৫৫০ বুশেল গোনা শেষ করতেন। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ, সেসা যদি শস্য গোনার কাজে তাঁর জীবনের বাকি সমস্ত দিনগুলোও লাগাতেন তাহলেও পুরস্কারের একটা নগণ্য অংশই পেতেন তিনি।

৪৪. দ্রুত বংশ বিস্তার

একটা পাকা পপিতে থাকে ছোট ছোট বীজ, তাদের সব ক'টা থেকেই গজাতে পারে নতুন গাছ। যদি সবগুলো বীজকেই বুনে দেয়া যায়, আর তা থেকে গাছ গজায় তাহলে মোট কত গাছ হবে? এটা বের করতে হলে জানতে হবে প্রত্যেকটা পপিতে কতগুলো করে বীজ আছে। কাজটা খুবই একঘেয়ে। কিন্তু এর ফলটা এত মজার যে ধৈর্য ধরে হিসেবটা নিখুঁতভাবে করে ফেললে সময়টা নষ্ট হবে না। প্রথমেই দেখতে পাবে যে প্রত্যেকটা পপি-ফলে গড়ে ৩০০০ করে বীজ থাকে।

তারপর? তারপরেই দেখতে পাবে যে এই পপি গাছের চারপাশে যদি যথেষ্ট জমি থাকে, তাহলে প্রতিটি বীজ থেকেই গাছ হবে, আর আগামী গ্রীষ্মকালেই আমরা পেয়ে যাব ৩০০০টা পপি গাছ। মাত্র একটা পপি থেকে হবে পুরো এক পপি বাগান।

তারপর কি দাঁড়াবে সেটা দেখা যাক। এই ৩০০০ পপি গাছের প্রত্যেকটিতেই অন্তত একটা করে পপি-ফল পাওয়া যাবে (আরও বেশি হওয়াই স্বাভাবিক), আর তাতে থাকবে ৩০০০টা করে বীজ। এগুলো গজালে প্রত্যেকটি থেকে হবে ৩০০০টা নতুন চারা। তাহলেই দ্বিতীয় বছরের শেষে আমরা পাব কমপক্ষে

$$৩০০০ \times ৩০০০ = ৯০,০০,০০০টা\ গাছ$$

এখন হিসেব করা খুবই সহজ যে তৃতীয় বছরের শেষে আমাদের একটিমাত্র পপির বংশধরের সংখ্যা দাঁড়াবে :

$$৯০,০০,০০০ \times ৩০০০ = ২৭,০০,০০,০০,০০০$$

চার বছরের শেষে

$$২৭,০০,০০,০০,০০০ \times ৩০০০ = ৮,১০,০০,০০,০০,০০,০০০$$

পাঁচ বছরের শেষে সমস্ত পৃথিবীতেও এই পপি গাছের স্থানসংকুলান হবে না, তাদের সংখ্যা তখন দাঁড়াবে :

$$৮,১০,০০,০০,০০,০০,০০০ \times ৩০০০ = ২,৪৩,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০$$

আর সমস্ত মহাদেশ এবং দ্বীপগুলোর আয়তন নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর পরিধি হলো মাত্র ১৩,৫০,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার বা ১৩,৫০,০০,০০,০০,০০,০০০ বর্গমিটার।

যতগুলো পপি গাছ এ সময়ের মধ্যে গজাতে পারবে জায়গাটা তার প্রায় ২০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

Scanned by CamScanner

দেখতে পাচ্ছ, যদি সমস্ত পপি বীজ থেকেই চারা হয়, তাহলে এক বর্গ মিটারে ২০০০ চারা হিসেবে পাঁচ বছরের ভেতরই একটামাত্র পপির বংশ সারা পৃথিবীর মাটি ছেয়ে ফেলবে। ছোট্ট পপি বীজটায় এমন একটা দানবীয় সংখ্যা লুকিয়ে আছে, তাই না?

অল্প বীজ হয় এমন গাছ দিয়েও ব্যাপারটা দেখা যেতে পারে। ফল তাতে সমানই হবে। শুধু এক্ষেত্রে সারা পৃথিবীর মাটি ছেয়ে ফেলতে গাছগুলোর পাঁচ বছরের কিছু বেশি সময় লাগবে। যেমন ধরা যাক, ডান্ডেলিয়ন ফুলের কথা। এতে বছরে গড়ে বীজ হয় ১০০টা*। সমস্ত বীজ থেকেই যদি গাছ গজায় তাহলে আমরা পাচ্ছি :

১ম বছরের শেষে	১টি চারা
২য় বছরের শেষে	১০০টি চারা
৩য় বছরের শেষে	১০,০০০টি চারা
৪র্থ বছরের শেষে	১০,০০,০০০টি চারা
৫ম বছরের শেষে	১০,০০,০০,০০০টি চারা
৬ষ্ঠ বছরের শেষে	১০,০০,০০,০০,০০০টি চারা
৭ম বছরের শেষে	১০,০০,০০,০০,০০,০০০টি চারা
৮ম বছরের শেষে	১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০টি চারা
৮ম বছরের শেষে	১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০টি চারা

সমস্ত পৃথিবীতে যত বর্গমিটার জমি আছে তার ৭০ গুণেরও বেশি জমি দরকার এই চারাগুলোর জন্যে।

তাহলে, নয় বছর বাদে প্রতি বর্গমিটারে ৭০টি হিসেবে সমস্ত মহাদেশগুলো ঢাকা পড়ে যাবে ডান্ডেলিয়ন ফুলে।

তাহলে, এমনটা হয় না কেন? কারণ খুবই সোজা। একটা বিরাট সংখ্যার বীজ গাছ গজাবার আগেই নষ্ট হয়ে যায়, হয় তারা পড়ে অনুর্বর জমিতে, না হয় ঢাকা পড়ে যায় অন্য গাছের নিচে, অথবা যদি শেকড় গজায় জন্তু-জানোয়ার নষ্ট করে ফেলে তাদের। বীজ আর চারাগুলো যদি এভাবে গাদায় গাদায় নষ্ট না হতো তাহলে তারা অতি অল্প দিনের ভেতর ছেয়ে ফেলত আমাদের এই গ্রহকে।

শুধু উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই নয়, প্রাণীর ক্ষেত্রেও এমনই ঘটে। এরা যদি মরে না যেত, তাহলে আজ হোক বা কালই হোক মাত্র একজোড়া প্রাণীর সন্তান-সন্ততিতেই গিজগিজ করত পৃথিবী। মৃত্যু যদি প্রাণীর বৃদ্ধিকে রোধ না করত, তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াত তার জ্বলন্ত উদাহরণ হলো পঙ্গপালের বিস্তীর্ণ এলাকা ছেয়ে ফেলা। কয়েক বছর বাদেই আমাদের মহাদেশগুলো ছেয়ে যেত জঙ্গল আর তৃণভূমিতে, এবং তার ভেতর গিজগিজ

---

* ২০০ বীজ হয় এমন ডান্ডেলিয়ন ফুলও পাওয়া যায়—তবে তা খুব বিরল।

Scanned by CamScanner

করত প্রাণী, তারা একটু জায়গার জন্যে মারামারি করত নিজেদের ভেতর। সাগরগুলোতে মাছ এত বেড়ে যেত নৌকো চালাবার প্রশ্নই আসত না। আর আমরাও দিনের আলো আর দেখতে পেতাম না, কারণ অসংখ্য পাখি আর পতঙ্গ ঘুরে বেড়াত আকাশে।

সাধারণ মাছির উদাহরণটাই নেয়া যাক। সে এক অদ্ভুত বিরাট সংখ্যা। ধরে নেয়া যাক, প্রতিটি স্ত্রী মাছি ১২০টি করে ডিম পাড়ে; গ্রীষ্মকালের মধ্যে এই ১২০টি ডিম থেকে জন্ম নিতে পারে মাছিদের ৭ পুরুষ, এদের ভেতর অর্ধেক আবার স্ত্রী মাছি। ধরে নেয়া যাক ১৫ এপ্রিল তারিখে জন্মাল প্রথম ডিমটা, আর তার ২০ দিনের মধ্যেই স্ত্রী মাছিগুলো ডিম পাড়বার মতো বড় হলো। দৃশ্যটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে তাহলে :

১৫ এপ্রিল একটা স্ত্রী মাছি ডিম পাড়ল। মে মাসের প্রথম দিকে তা থেকে হলো ১২০টি মাছি। তাদের ভেতর ৬০টাই স্ত্রী মাছি।

৫ মে তারিখে প্রত্যেকটি স্ত্রী মাছি ১২০টা ডিম পাড়বে, আর মাসের মাঝামাঝি তা থেকে হবে ৬০ × ১২০ = ৭২০০টা মাছি, এদের ভেতর ৩৬০০টা স্ত্রী মাছি।

২৫ মে এই ৩৬০০ স্ত্রী মাছির প্রত্যেকে ১২০টা করে ডিম পাড়বে আর জুন মাসের প্রথম দিকে তা থেকে হবে ৩৬০০ × ১২০ = ৪,৩২,০০০টা মাছি, তার ভেতরে ২,১৬,০০০টা স্ত্রী মাছি।

১৪ জুন প্রত্যেক স্ত্রী মাছি ১২০টা করে ডিম পাড়বে, মাসের শেষে ১,২৯,৬০,০০০টা স্ত্রী মাছিসহ মোট মাছি হবে ২,৫৯,২০,০০০টা।

৫ জুলাই ১,২৯,৬০,০০০টা স্ত্রী মাছি (৭৭,৭৬,০০,০০০টা স্ত্রী মাছি)।

২৫ জুলাই হবে ৯৩,৩১,২০,০০,০০০টা মাছি। তাদের ভেতর ৪৬,৬৫, ৬০,০০,০০০টা হবে স্ত্রী মাছি।

১৩ আগস্ট সেই সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৫৫,৯৮,৭২,০০,০০,০০০, এদের ভেতর ২৭,৯৯,৩৬,০০,০০,০০০টা মাছি হবে স্ত্রী-জাতের।

১ সেপ্টেম্বর জন্মাবে ৩৫,৫৯,২৩,২০,০০,০০,০০০টা মাছি।

একটা গ্রীষ্ম ঋতুতে যত মাছি জন্মাতে পারে, তারা যদি কেউ না মরে যায় বা তাদের আর কিছু না ঘটে, সেই বিরাট সংখ্যক মাছির একটা পরিষ্কার ছবি দিচ্ছি। দেখা যাক, তারা সার বেঁধে দাঁড়ালে কী হয়। একটা মাছি ৫ মিলিমিটার লম্বা, তাহলে এই লাইনটা হবে ২,৫০,০০,০০,০০০ কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব তারও ১৮ গুণ বেশি (ইউরেনাস গ্রহটার পৃথিবী থেকে যতটা দূরত্ব, প্রায় ততটা)। সবশেষে, উপযুক্ত অবস্থায় প্রাণীর অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধির কয়েকটা ঘটনা বললে মন্দ হবে না।

মার্কিন মুলুকে আগে কোনো চড়ুই ছিল না। সেখানে তাদের আমদানি হয় পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্যে। তোমরা তো জানোই যে চড়ুই শুঁয়োপোকা আর ফলের বাগান এবং সব্জি ক্ষেত ধ্বংসকারী অন্যান্য পোকাও খেয়ে থাকে। বোধহয় চড়ুইদের

Scanned by CamScanner

ভালো লেগে গিয়েছিল ওই দেশটা, ওদের নষ্ট করবার মতো কোনো প্রাণী বা শিকারি পাখি ছিল না সেখানে। ওদের বংশ বাড়তে লাগল দ্রুতগতিতে। পোকামাকড়ের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে গেল। কিন্তু চড়ুইদের সংখ্যা হুহু করে বেড়ে উঠল। এরপর এমন একটা সময় এলো যখন তাদের জন্যে আর উপযুক্ত সংখ্যায় পিঁপড়েও থাকল না। তারা তখন শস্য নষ্ট করতে শুরু করল।* রীতিমতো একটা যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো চড়ুইদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এতে এত খরচ হলো শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন করে বাইরে থেকে প্রাণী আমদানি বন্ধ করা হলো।

আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইউরোপিয়ানদের অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের আগে সেখানে কোনো খরগোস ছিল না। ১৮ শতাব্দীর শেষদিকে প্রথম খরগোস আমদানি হলো সেখানে। খরগোসদের খেয়ে ফেলার মতো কোনো শিকারি জন্তু ছিল না সেখানে। অল্পদিনের ভেতরই খরগোসের দল অস্ট্রেলিয়া ছেয়ে ফেলে ফসল নষ্ট করতে শুরু করল। উৎপাতটা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। খরগোসদের বিনষ্ট করতে বিপুল ব্যয় হয়ে গেল। সাধারণ মানুষের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যবস্থাই শেষে এই ক্ষয়ক্ষতিকে রোধ করল। আরও পরে প্রায় এই ধরনেরই ঘটনা ঘটেছিল ক্যালিফোর্নিয়াতে।

তৃতীয় গল্পটা এসেছে জামাইকা থেকে। সেখানে ছিল বহু বিষধর সাপ। ওদের ধ্বংস করার জন্যে সেক্রেটারি পাখি আনা ঠিক হলো। সাপের ভয়ানক দুশমন বলে নাম আছে এদের। সাপের সংখ্যাটা কমে গেল ঠিকই, কিন্তু যে মেঠো ইঁদুরগুলোকে সাপ খেয়ে ফেলত তারা বাড়তে লাগল। ইঁদুরগুলো আখের আবাদের এত ক্ষতি করল যে কৃষকরা এদের বিনাশ করে ফেলা ঠিক করে চার জোড়া ভারতীয় বেজী নিয়ে এলো—এরা ইঁদুরের শত্রু বলে পরিচিত। ওদের যথেচ্ছভাবে বাড়তে দেয়া হলো। আর অল্প সময়ের ভেতরই দ্বীপটা ছেয়ে ফেলল তারা। কিন্তু তা করতে গিয়ে ওদের আর খাবারের বাছবিচার রইল না : কুকুরের বাচ্চা, মেষশাবক, শুয়োর ছানা আর মুরগিগুলোকে তারা আক্রমণ করতে লাগল, নষ্ট করে ফেলল ডিমগুলোকে। তাদের সংখ্যা আরও বেড়ে গেলে তারা ফলের বাগিচা, গমের ক্ষেত আর আবাদের ভেতর ঢুকে পড়ল স্রোতের মতন। পুরনো এই বন্ধুদের ওপর দ্বীপবাসীরা তখন খাপ্পা হয়ে উঠল, কিন্তু ক্ষতিরোধ করতে শুধু আংশিকভাবেই সফল হলো তারা।

---

* হাওয়াই দ্বীপে তারা অন্য সব ছোট পাখিদের তাড়িয়ে দিয়েছিল।

Scanned by CamScanner

৪৫. বিনা পয়সার ভোজ

মাধ্যমিক পরীক্ষা-উত্তীর্ণ দশজন তরুণ ঠিক করল একটা রেস্তোরাঁয় ভোজের উৎসব করবে তারা। সবাই এসে পৌঁছবার পর যখন প্রথম খাবারের থালা পরিবেশন করা হলো, তখন কোন আসনে কে বসবে এই নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হলো। একজন প্রস্তাব করল—নামের অক্ষর অনুযায়ী বসা যাক। অন্যরা বসতে চাইল বয়স হিসেবে। আবার অন্য সকলে বলল যে পরীক্ষা পাসের নম্বর অনুসারে বসা হোক। তর্কটা চলতে লাগল। খাবার জুড়িয়ে জল জয় গেল তবু কেউই বসল না। পরিবেশক মীমাংসা করে দিল সমস্যাটার।

সে বলল, "তরুণ বন্ধুরা, তর্কটা থামিয়ে আমার কথা শুনুন। যে যেখানে আছেন সেখানেই বসে আমার বক্তব্যটা শুনুন।

"আপনারা এখন যেভাবে বসে আছেন, আপনাদের কেউ সেটা লিখে নিন। কাল আবার এসে অন্য কোনোভাবে বসুন—যতদিন সবরকমভাবে বসা না হচ্ছে এভাবে আসতে থাকুন। এখন যেভাবে বসে আছেন আবার যখন সেভাবে বসবার সময় আসবে, তখন আমি কথা দিচ্ছি, প্রতিদিন আপনারা যে কোনো ভালো খাবার খেতে চাইবেন, তা আমি বিনা পয়সায় খাওয়াব আপনাদের।"

প্রস্তাবটা খুবই লোভনীয়। ঠিক হলো প্রতিদিন তারা রেস্তোরাঁয় আসবে আর যতরকমভাবে বসা সম্ভব সবরকমে বসা হবে, যাতে করে পরিবেশকের কথামতো বিনা পয়সায় খাবার খাওয়া যায়।

সে দিনটা কিন্তু আর কোনোদিনই এলো না। তার কারণ এই নয় যে পরিবেশক তার কথা রাখতে পারল না। কারণটা হলো : টেবিলে দশজন মানুষ বসবার অনেক অনেক ধরন ছিল। সত্যি বলতে কি ৩৬,২৮,৮০০ ধরনে তা হতে পারত। তোমরা দেখতে পাবে, সবরকমভাবে বসে দেখতে গেলে প্রায় ১০,০০০ বছর লেগে যাবার কথা।

দশজন মানুষ যে এত ধরনে একটা টেবিলে বসতে পারে তা হয়তো বিশ্বাস করছ না তোমরা। নিজেরাই হিসেব করে দেখতে পারো।

বিন্যাসের সংখ্যাটা কত হতে পারে সেই হিসেবটা করতে হবে সবচেয়ে আগে। এটাকে যথা সম্ভব সহজ করার জন্যে তিনটে জিনিস নিয়ে শুরু করা যাক। এদের নাম দিচ্ছি আমরা 'ক', 'খ', আর 'গ'।

আমাদের যা বের করতে হবে তা হলো এই জিনিসগুলো কত বিভিন্ন ধরনে সাজানো যায়। প্রথমে গ-কে আলাদা করে রেখে মাত্র দুটো জিনিস নিয়েই এটা করা যাক। আমরা দেখছি যে এদের সাজাবার মাত্র দুটিই উপায় আছে (চিত্র-১৭)।

এখন এই দুটোর প্রত্যেকটার সঙ্গে গ যোগ করছি। এটা করা যায় তিনটে বিভিন্নভাবে (চিত্র-১৮) :

Scanned by CamScanner

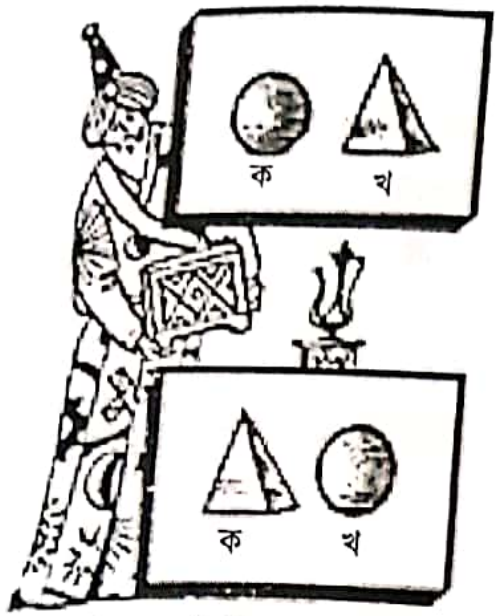

(১) গ-কে আমরা ঐ জোড়াটার পেছনে বসাতে পারি;

(২) সামনে বসাতে পারি;

(৩) দুটো জিনিসের মাঝখানে বসাতে পারি। দেখা যাচ্ছে, আর কোনোভাবে এটাকে বসানো যায় না। এখন আমাদের আছে দুই জোড়া জিনিস, ক খ আর খ ক, তাহলে দাঁড়াচ্ছে : জিনিসগুলোকে সাজাবার ২ × ৩ = ৬টা উপায় হতে পারে।

১৮ নং ছবিতে এই সাজানোটা দেখানো হয়েছে।

১৭ নং ছবি। দু'টি জিনিসকে মাত্র দু'ভাবে বসানো যায়।

ক, খ, গ আর ঘ—এই চারটে জিনিস নিয়ে শুরু করা যাক। এখনকার মতো আমরা ঘ-কে আলাদ করে রেখে তিনটে জিনিস নিয়েই সবরকমভাবে সাজাব। ছয় রকমভাবে তা করা যায় আমরা ইতিমধ্যেই তা জেনেছি। তিনটে জিনিসের ছয় রকমভাবে সাজানোতে কত রকমভাবে চতুর্থ জিনিস ঘ-কে বসানো যায়? সেটা দেখা যাক। আমরা ঘ-কে

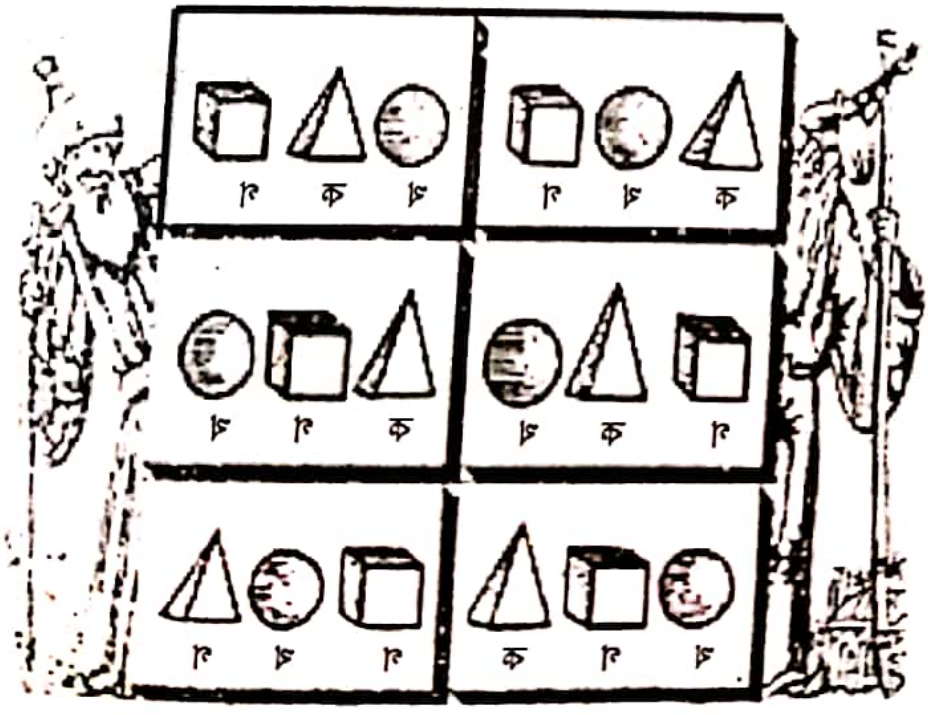

১৮ নং ছবি। তিনটি জিনিস রাখা যায় ছয় রকম ভাবে।

Scanned by CamScanner

(১) তিনটে জিনিসের আগে বসাতে পারি;

(২) পরে বসাতে পারি;

(৩) প্রথম এবং দ্বিতীয় জিনিসের মাঝখানে বসাতে পারি;

(৪) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জিনিসটার ভেতর বসাতে পারি।

তাহলে, আমরা পাচ্ছি : ৬ × ৪ = ২৪ রকমের সাজানো যায়।

যেহেতু ৬ = ২ × ৩ আর ২ = ১ × ২, তাহলে সবরকমের বিন্যাসের সংখ্যাটা এভাবে লেখা যায় :

$$১ \times ২ \times ৩ \times ৪ = ২৪$$

এখন যদি ঐ একই নিয়মে পাঁচটা জিনিসকে সাজানো যায়, তাহলে আমরা পাব :

$$১ \times ২ \times ৩ \times ৪ \times ৫ = ১২০$$

ছয়টা জিনিস হলে

$$১ \times ২ \times ৩ \times ৪ \times ৫ \times ৬ = ৭২০ \text{ ইত্যাদি।}$$

দশজন তরুণের কাহিনীতে আবার ফিরে আসা যাক। এক্ষেত্রে একটু কষ্ট করে যদি হিসেবটা করি, তাহলে যত ধরনে তাদের বসানো যায় তার সংখ্যা হলো :

$$১ \times ২ \times ৩ \times ৪ \times ৫ \times ৬ \times ৭ \times ৮ \times ৯ \times ১০$$

এর উত্তর হবে

$$৩৬,২৮,৮০০$$

হিসেবটা আরও জটিল হতো যদি এদের অর্ধেক হতো মেয়ে, আর তারা প্রত্যেকে পালা করে প্রত্যেকটি ছেলের সঙ্গে বসতে চাইত। যদিও এক্ষেত্রে বসার ব্যবস্থার সংখ্যাটা হতো আরও ছোট, তাহলেও হিসেবটা হতো কঠিন।

ছেলেদের একজনকে, সে যেখানে বসতে চায় সেখানেই তাকে বসতে দেয়া যাক। অন্য চারজন, তাদের মাঝে মাঝে মেয়েদের জন্যে আসন খালি রেখে বসতে পারে ১ × ২ × ৩ × ৪ = ২৪ রকমভাবে। চেয়ার আছে দশটা, তাহলে প্রথম ছেলেটি বসতে পারে দশটা বিভিন্ন জায়গায়। তাহলে ১০ × ২৪ = ২৪০ রকম উপায়ে ছেলেরা টেবিলের চারপাশে বসতে পারছে।

ছেলেদের মাঝে মাঝে খালি জায়গাগুলোতে মেয়েরা কতরকমভাবে বসতে পারে? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫ = ১২০ রকমভাবে। ছেলেদের ২৪০ ধরনের বসার সঙ্গে মেয়েদের ১২০ ধরনের বসাকে একত্র করলেই আমরা বসবার সম্ভাব্য সংখ্যাটা পেয়ে যাব। তা হলো :

$$২৪০ \times ১২০ = ২৮,৮০০$$

এটা অবশ্য ছেলেদের ৩৬,২৮,৮০০ উপায়ে বসার সংখ্যার চেয়ে অনেক কম, আর তাতে ৭৯ বছরের কিছু কম সময় লাগবে। তার মানে হলো, ছেলেরা যদি ১০০ বছর

Scanned by CamScanner

বয়স অবধি বাঁচে, তাহলে তারা বিনা পয়সায় খাওয়াটা পরিবেশকের কাছ থেকে না পেলেও পাবে তার উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে।

এখন কি করে বিন্যাসের সংখ্যাটা বের করতে হয় তা আমরা শিখেছি। তাহলে 'পনেরোর ধাঁধা'র বাক্সতে ঘুঁটি সাজাবার সংখ্যাটাও বের করতে পারি আমরা*। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, এই খেলায় কোনো খেলোয়াড়কে যতরকমের ধাঁধার মুখোমুখি হতে হবে তার আমরা সমাধান করতে পারব। এটা সহজেই দেখা যাচ্ছে যে কাজটা হলো এই ১৫টা ঘুঁটিকে কতরকমে সাজানো যায় তা বের করা। এটা করতে হলে, আমরা জানি নিচের গুণটা করতে হবে :

১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫ × ৬ × ৭ × ৮ × ৯ × ১০ × ১১ × ১২ × ১৩ × ১৪ × ১৫

উত্তর হলো :

১৩,০৭,৬৭,৪৩,৬৫,০০০

এই বিরাট সংখ্যার ধাঁধাগুলোর অর্ধেকই সমাধান করা যায় না। তাহলেই ৬০,০০০ কোটির উপর সমস্যা আছে যার কোনো সমাধান নেই। লোকেরা যে এটা সন্দেহও করেনি, তাতেই বোঝা যায় পনেরোর ধাঁধা'র জন্যে তারা কেন এত পাগল হয়ে উঠেছিল।

এটাও দেখা যাক, যদি প্রতি সেকেন্ডে একটি করে ঘুঁটি সাজানো যেত, তাহলে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে সাজাতে ৪০,০০০ বছরেরও বেশি লাগত। আর তাও হতো যদি কেউ একেবারে না থেমে কাজটা করত।

সাজানোর ব্যাপারে আলোচনা প্রায় শেষ করে এনেছি আমরা। স্কুলজীবনের একটা ধাঁধা এবার সমাধান করা যাক।

ধরা যাক একটা ক্লাসে ২৫ জন ছাত্র আছে। কতরকমভাবে বসানো যায় তাদের? উপরের যে ধাঁধাটা বলা হলো তা যারা ভালো করে বুঝেছ, এটা সমাধান করতে তাদের কোনো মুস্কিল হবে না। যে কাজটা করতে হবে তা হলো ২৫টা সংখ্যাকে এভাবে গুণ করতে হবে :

১ × ২ × ৩ × ৪ × ৫ × ৬ × ..... × ২৩ × ২৪ × ২৫

অনেক ব্যাপারকে সহজ করে করার অনেক উপায় আছে গণিতে। কিন্তু উপরে যেটা বলা হলো, তার জন্যে কোনো সোজা উপায় নেই। ঠিকভাবে এটাকে করার একটিমাত্রই উপায় আছে, তা হলো সবগুলোকে গুণ করা। এর জন্যে সময় বাঁচাবার উপায় যা আছে তা হলো গুণগুলোকে ঠিকমতো সাজানো। ফল হবে বিরাট। এতে থাকবে ২৬টি সংখ্যা। এটা এত অদ্ভুত বড় যে তা ধারণ করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

---

* এক্ষেত্রে খালি ঘরটা সবসময়েই থাকবে ডান দিকের নিচের কোণে।

Scanned by CamScanner

সংখ্যাটা হলো:

১,৫৫,১১,২১,০০,৪৩,৩৩,০৯,৮৫,৯৮,৪০,০০০

এ পর্যন্ত যত সংখ্যা আমরা দেখেছি তার ভেতর এটাই সবচাইতে বড়। এ জন্যেই একে একটি 'দানবীয় সংখ্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এর সঙ্গে তুলনায় সমস্ত সমুদ্র আর মহাসাগরে যত জল বিন্দু আছে তাও অনেক কম।

৪৬. মুদ্রার জাদু

আমার মনে পড়চে ছেলেবেলায় আমার দাদা আমাকে মুদ্রা দিয়ে একটা মজার খেলা দেখিয়েছিল। প্রথমে সে তিনটে প্লেটকে সারবন্দি করে সাজাল। তারপর বিভিন্ন মূল্যের পাঁচটা মুদ্রাকে বড় থেকে ছোট হিসেবে একটার উপর আর একটা রাখল (১ রুবল, ৫০ কোপেক, ২০ কোপেক, ১৫ কোপেক আর ১০ কোপেক* মুদ্রা)।

কাজটা হচ্ছে নিচের তিনটে নিয়ম মেনে মুদ্রাগুলোকে তৃতীয় প্লেটে চালান করা :

(১) একবারে মাত্র একটা মুদ্রা চালান করা যাবে; (২) ছোট মুদ্রার উপর বড় মুদ্রা বসানো চলবে না আর (৩) প্রথম দুটো নিয়মমাফিক মাঝের প্লেটটাকে সাময়িকভাবে ব্যবহার করা চলবে। কিন্তু সবশেষে মুদ্রাগুলোকে আগের মতো করে তৃতীয় প্লেটেই সাজাতে হবে।

দাদা বলল, "বুঝলে, নিয়মটা খুবই সহজ। এবার আরম্ভ করো।"

আমি ১০ কোপেক মুদ্রাটা নিয়ে তৃতীয় প্লেটে রাখলাম। তারপর ১৫ কোপেকটা নিয়ে রাখলাম মাঝের প্লেটে, তারপরই আটকে গেলাম আমি। ২০ কোপেক মুদ্রাটা কোথায় রাখব? এটা তো দুটো থেকেই বড়।

দাদা আমাকে দেখিয়ে দিতে এগিয়ে এলো, "আচ্ছা, ১০ কোপেকের মুদ্রাটাকে ১৫ কোপেক মুদ্রার উপরে বসাও। তাহলেই ২০ কোপেক মুদ্রাটার জন্যে তৃতীয় প্লেটটা খালি পাবে।"

আমি তাই করলাম। কিন্তু আমার অসুবিধে এতেই শেষ হলো না। ৫০ কোপেক মুদ্রাটা কোথায় রাখব? অল্পসময়ের ভেতরই উপায়টা পেয়ে গেলাম। ১০ কোপেক মুদ্রাটাকে রাখলাম প্রথম প্লেটে, ১৫ কোপেকটা রাখলাম তৃতীয়টাতে, তারপর ১০ কোপেককে চালান করলাম সেখানে। এবারে ৫০ কোপেক মুদ্রাকে দ্বিতীয় প্লেটে রাখা সম্ভব হলো। তারপর অসংখ্য চাল দেবার পর রুবলের মুদ্রাটাকে প্রথম প্লেট থেকে সরাতে পারলাম। তারপরই সব কটা এসে গেল তৃতীয় প্লেটে।

দাদা আমার এই সমাধানের কায়দাটাকে তারিফ করে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, মোট কতগুলো চাল দিলে তুমি?"

---

* বিভিন্ন মাপের যে কোনো পাঁচটা মুদ্রা দিয়ে খেলা চলতে পারে।

Scanned by CamScanner

"জানি না, শুনিনি তো আমি?"

"আচ্ছা বেশ। হিসেব করা যাক। কিভাবে সবচেয়ে কম চাল দিয়ে এটা করা যায় তা জানতে খুব মজা লাগবে। ধরা যাক, আমাদের পাঁচটা না থেকে মাত্র দুটো মুদ্রাই ছিল; ১৫ আর ১০ কোপেক। তাহলে মোট কত চাল লাগছে তোমার?"

"তিনটে। ১০ কোপেক মুদ্রাটা যাবে মাঝের প্লেটে, ১৫ কোপেক মুদ্রা যাবে তৃতীয়টাতে, তারপর ১০ কোপেক মুদ্রাটা যাবে এর উপরে।"

"ঠিক, এবার এর সঙ্গে আর একটা মুদ্রা যোগ করা যাক। ২০ কোপেকের মুদ্রা যোগ করার পর দেখা যাক মুদ্রার থাকটা চালান করতে কয়টা চাল লাগবে আমাদের। আমরা জানি এটা করতে লাগবে তিনটে চাল। তারপর ২০ কোপেকের মুদ্রাটিকে আমরা চালান করলাম তৃতীয় প্লেটে। এই আর একটা দান। তারপর দ্বিতীয় প্লেটটা থেকে মুদ্রা দুটোকে চালান দেয়া হলো তৃতীয়টাতে। এই হলো আরও তিনটে চাল। তাহলেই আমাদের দিতে হবে : ৩ + ১ + ৩ = ৭টা চাল।"

"চারটে মুদ্রার জন্যে ক'টা চাল লাগবে তা হিসেব করে দেখা যাক", আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম। "প্রথমে ছোট তিনটে মুদ্রা চালান করলাম মাঝের প্লেটে, এতে হলো সাতটা দান। তারপর ৫০ কোপেকের মুদ্রাটাকে সরিয়ে দিলাম তৃতীয় প্লেটে। এই হলো আরও একটা চাল। সবশেষে ছোট মুদ্রা তিনটিকে তৃতীয় প্লেটে এই হলো আরও একটা চাল। সবশেষে মুদ্রা তিনটিকে তৃতীয় প্লেটে চালান হলো। এই হলো আরও সাতটা চাল। সবসুদ্ধ হবে : ৭ + ১ + ৭ = ১৫টা চাল।"

"চমৎকার! পাঁচটা মুদ্রায় কি হবে তাহলে?"

"এ তো সোজা : ১৫ + ১ + ১৫ = ৩১", আমি চটপট উত্তর করলাম।

"বাঃ, ব্যাপরটা বেশ ধরে ফেলেছে তো! আমি তোমাকে এটা করার আরও একটা সোজা উপায় দেখাচ্ছি। ৩, ৭, ১৫ আর ৩১, যে যে সংখ্যা আমরা পেয়েছি সেগুলো ধরা যাক। এদের সব ক'টার অর্থ হলো ২-কে ২ দিয়েই একবার বা বারবার গুণ করে তা থেকে ১ বিয়োগ দিয়ে যা হয়। এই দেখো না!"

তারপর আমার দাদা এই ছকটা লিখল :

$$৩ = ২ \times ২ - ১$$
$$৭ = ২ \times ২ \times ২ - ১$$
$$১৫ = ২ \times ২ \times ২ \times ২ - ১$$
$$৩১ = ২ \times ২ \times ২ \times ২ \times ২ - ১$$

"এবার বুঝতে পেরেছি আমি, যতটা মুদ্রা আমাকে চালান করতে হবে ২-কে ততবার ২ দিয়েই গুণ করলাম। তারপর তা থেকে বিয়োগ করলাম ১। এবার তাহলে

Scanned by CamScanner

মুদ্রার থাক সরাতে কত বার চাল দিতে হবে তা হিসেব করা শিখলাম। ধরা যাক, আমাদের আছে সাতটা মুদ্রা। ব্যাপারটা এই রকম হবে তাহলে :

২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ২ - ১ = ১২৮ - ১ = ১২৭।"

আমার দাদা বলে চলল, "তুমি তাহলে এই পুরনো খেলাটা শিখলে। আর একটামাত্র নিয়ম মনে রাখতে হবে তোমাকে : যদি মুদ্রার সংখ্যাটা বিজোড় হয়

তাহলে প্রথম মুদ্রাটাকে রাখবে তৃতীয় প্লেটে, আর যদি জোড়া হয়। তাহলে প্রথম রাখবে দ্বিতীয় প্লেটে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "খেলাটা কি সত্যিই পুরনো? আমি তো ভেবেছিলাম এটা তোমার নিজের!"

"না, আমি এটাকে মুদ্রা দিয়ে একটু আধুনিক করেছি মাত্র। খেলাটা খুবই পুরনো। সম্ভবত এটা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। এর সঙ্গে একটা মজার গল্প জড়িয়ে আছে। বারানসিতে একটা মন্দির আছে। শোনা যায় ব্রহ্মা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন সেখানে রেখেছিলেন তিনটে হীরের কাঠি। তারই একটাতে পরালেন ৬৪টা সোনার। আংটা। তার সবচেয়ে বড়টা ছিল একেবারে নিচে, আর ছোটটা সবার ওপরে পুরোহিতদের সারা দিনরাত ঐ আংটাগুলোকে একটা কাঠি থেকে আর একটা কাঠিতে চালান করার কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো তৃতীয় কাঠিটা এই কাজে সাহায্য করত, নিয়ম-কানুন ছিল ঠিক আমাদের মুদ্রার খেলার মতন। একবারে একটা আংটাই সরানো যেত, আর কোনো ছোট আংটার ওপর বড় আংটা বসানো চলত না। গল্পে আছে, যেদিন সমস্ত আংটা চালান করা শেষ হবে, সে দিনই পৃথিবীর শেষ।"

"এ গল্পটা বিশ্বাস করলে তো পৃথিবীর বহু আগেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

"তুমি ভাবছ এভাবে ৬৪টা আংটা চালান করতে খুব বেশি দেরি হবে না, তাই না?"

"নিশ্চয়ই, খুব বেশি সময় লাগবে না। ধরো না, যদি প্রত্যেকবার চালান করতে এক সেকেন্ড করে লাগে, তার মানে হলো এক ঘণ্টায় একজন লোক ৩৬০০ বার ওগুলো সরাতে পারবে।"

"বেশ তো।"

"তাহলে একদিনে হবে প্রায় ১ লক্ষ বার আর দশদিনে হবে প্রায় ১০ লক্ষ বার। ১০ লক্ষটা চাল দিয়ে তুমি ১০০০টা আংটা চালান করতে পারবে বলে বিশ্বাস করি।"

"ভুল বললে তুমি। এই ৬৪টা আংটাকে চালান করতে তোমার লাগবে ৫০,০০০ কোটি বছর, এর একটুও কম বা একটুও বেশি নয়!"

"কিন্তু তা হবে কেন? মোট চালের সংখ্যা হবে ২-কে ৬৪ বার ২ দিয়ে গুণ করে তা থেকে ১ বিয়োগ দিয়ে ... তার মানে হলো ... আচ্ছা একটু দাঁড়াও .... এক সেকেন্ডের ভেতর উত্তরটা বলছি তোমাকে।"

Scanned by CamScanner

"বেশ, তুমি যতক্ষণে এই গুণটা করবে আমি অন্য কাজকর্ম করার প্রচুর সময় পাব ততক্ষণ।"

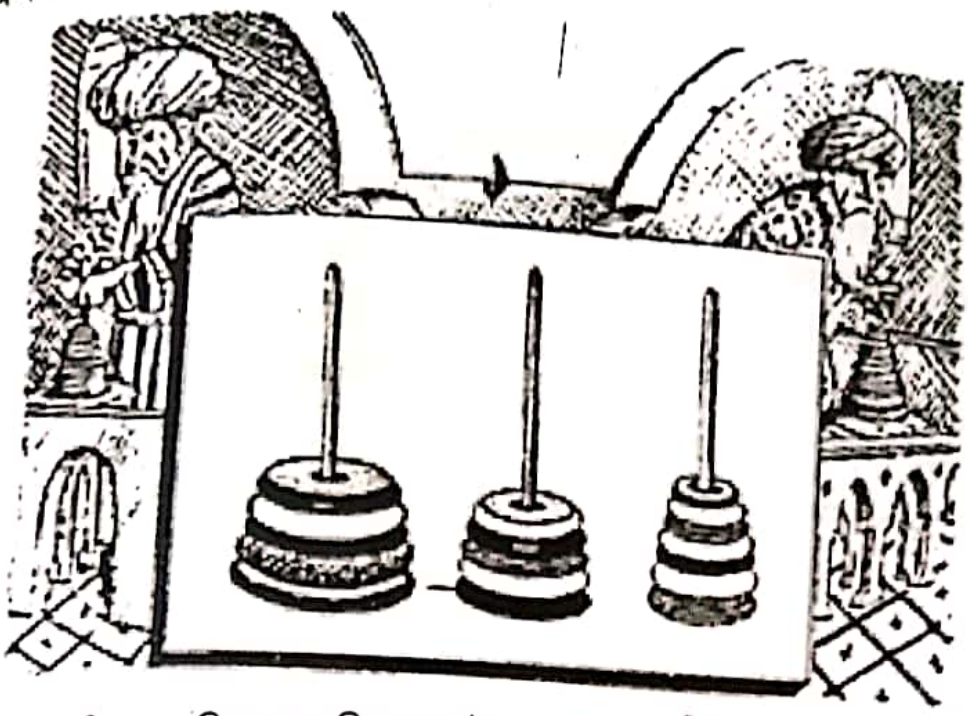

১৯ নং ছবি। পুরোহিতদের অবিরাম আংটাগুলোকে এক কাঠি থেকে আর একটা কাঠিতে চালান করার কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে।

দাদা চলে গেলে আমি বসে গেলাম হিসেবটা করতে। প্রথমে $২^{১৬}$-র ফলটা করে ফেললাম, হলো ৬৫,৫৩৬; এবার ঐ সংখ্যাকে ঐ সংখ্যা দিয়েই গুণ করলাম; যে ফল পেলাম তাকে আবার সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলাম। পরে তা থেকে বিয়োগ করলাম ১। এতে যে সংখ্যাটা পাওয়া গেল, তা হলো :

১,৮৪,৪৬,৭৪,৪০,৭৩,৭০,৯৫,৫১,৬৫১*

দাদা তাহলে ঠিকই বলেছিল।

এরই সঙ্গে আরও একটা জিনিস এসে পড়েছে। আমাদের পৃথিবীর বয়স কত তা হয়তো জানবার ইচ্ছে হতে পারে তোমাদের। বৈজ্ঞানিকরা সেটা বের করেছেন। অবশ্য এটা একটা মোটামুটি হিসেব :

সূর্যের বয়স	৫,০০,০০০	কোটি বছর
পৃথিবীর বয়স	৩০০	কোটি বছর
পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব	১০০	কোটি বছর
মানুষের বয়স	৩	লক্ষ বছরের কম নয়

---

* সংখ্যাটা আমাদের চেনা; দাবাখেলা আবিষ্কারের জন্যে সেসা এই পুরস্কারই চেয়েছিলেন।

Scanned by CamScanner

৪৭. বাজি ধরা

আমাদের ছুটি কাটানোর বাড়িটায় দুপুরে খেতে বসেছি আমরা। এমন সময় কথাবার্তা শুরু হলো। আলোচ্য বিষয় : একই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা। এর ভেতর একজন তরুণ গণিতজ্ঞ একটা মুদ্রা নিয়ে বলতে লাগল :

"দেখো সবাই, আমি না দেখে মুদ্রাটাকে টস করব টেবিলের ওপর। বলো তো, মাথার দিকটা উপর দিকে থাকার সম্ভাবনা কতটা?"

আর সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "সম্ভাবনা বলতে কী বুঝছ তা একটু পরিষ্কার করে বলবে তো—ব্যাপারটা কী সবাই তো আর তা জানে না!"

"সে খুব সোজা জিনিস। একটা মুদ্রার মাত্র দু'রকমভাবেই পড়ার সম্ভাবনা আছে, হয় ছবির দিক, নয়তো সংখ্যার দিক (১৯ নং ছবি)।"

এর ভেতর মাত্র একটাই আমাদের মনমতো হয়। তাহলে এই রকম হিসেব পাওয়া যাচ্ছে :

$$\frac{\text{মনমতোভাবে পড়ার সংখ্যা}}{\text{যতরকমভাবে পড়ার সম্ভাবনা তার সংখ্যা}} = ১/২$$

এই ১/২ ভগ্নাংশটা দিয়ে বোঝা যাবে কতবার ছবির দিক করে পড়ার সম্ভাবনা আছে।"

একজন বাধা দিয়ে বলল, "মুদ্রা নিয়ে করলে ব্যাপারটা খুবই সোজা।

অন্য কোনো জিনিস, যেমন ধরো একটা ছক্কা, তাই দিয়ে এটা করা যাক না!"

অঙ্কনবিশটি রাজি হলো তাতে, "বেশ তাই হবে, একটা ছক্কা নেয়া যাক। এর চেহারাটা ঘনক্ষেত্রকার পদার্থের মতো এবং এর প্রত্যেক পাশে সংখ্যা দেয়া আছে (৫৭ নং ছবি)। এখন বলো তো, ৬ পড়ার সম্ভাবনা কতটা? এটা কতবার ঘটতে পারে?

৬টা দিক আছে এর, তাহলে ১ থেকে ৬ যে কোনো সংখ্যাই পড়তে পারে। ৬ পড়লেই সেটা আমাদের মনমতো হবে। এক্ষেত্রে সম্ভাবনা হচ্ছে ১/৬।"

একটি মেয়ে প্রশ্ন করল, "কোনো ঘটনার সম্ভাবনা হিসেব করে বের করা কি সত্যিই সম্ভব? আমার একটা ধারণা আছে যে আমাদের জানালা দিয়ে প্রথম যে মানুষটিকে দেখা যাবে সে একটা পুরুষ মানুষ। আমার ধারণটা ঠিক হবার সম্ভাবনা কতটা?"

"যদি আমরা এক বছর বয়সের কোনো বাচ্চা ছেলেকেও পুরুষ বলে ধরে নিতে রাজি থাকি তাহলে এর সম্ভাবনা ১/২। কেননা পৃথিবীতে পুরুষ আর স্ত্রীলোকের সংখ্যা সমান।"

আর একজন প্রশ্ন করল, "প্রথম দু'জনই পুরুষ হবার সম্ভাবনা কতটা?"

"এখানে হিসেবটা আরও গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। যতরকমভাবে তারা আসতে পারে সব হিসেব করে দেখা যাক। প্রথমত, হতে পারে সকলেই হবে পুরুষ মানুষ। দ্বিতীয়ত,

Scanned by CamScanner

প্রথম জন হয়তো হবে পুরুষ, দ্বিতীয় জন হবে স্ত্রীলোক। তৃতীয়ত, ঘটনাটা একেবারে উল্টো হতে পারে : প্রথমে স্ত্রীলোক, তারপর পুরুষ।

চতুর্থত, ওদের দু'জনই স্ত্রীলোক হতে পারে। তাহলে তাদের বিভিন্নভাবে পরপর আসবার সম্ভাবনা হলো ৪। এর ভেতর প্রথমটাই আমাদের মনমতো। তাহলে সম্ভাবনার সংখ্যা হলো ১/৪। এই হলো তোমার প্রশ্নের সমাধান।"

"এটা তো পরিষ্কার। কিন্তু তিনজন মানুষের প্রশ্নও তো আসতে পারে? যে তিনজন আমাদের জানালা দিয়ে প্রথম যাবে তারা সকলেই পুরুষ হবে তার সম্ভাবনা কতটা?"

"বেশ, তাও হিসেব করা যায়। সম্ভাবনার সংখ্যাটাকে প্রথমে সাজিয়ে হিসেবটা শুরু করা যাক। দু'জন পথিকের জন্যে পরপর আসবার সংখ্যাটা হলো ৪। এর সঙ্গে একজন তৃতীয় পথিক যোগ করলে বিভিন্ন বিন্যাসের সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে, কারণ দু'জন পথিকের এই চারটে দলের সঙ্গে একজন পুরুষ বা একজন স্ত্রীলোকও যোগ হতে পারে। তাহলে এক্ষেত্রে পরপর বিন্যাসের সংখ্যা হচ্ছে ৪ × ২ = ৮। তাহলে সম্ভাবনার সংখ্যাটা হচ্ছে ১/৮। কারণ এর ভেতর মাত্র একটা বিন্যাসকেই চাই আমরা। সম্ভাবনার সংখ্যা বের করার উপায় হিসেব করা খুবই সোজা। দু'জন পথিকের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা হলো ১/২ × ১/২ = ১/৪, তিনজনের ক্ষেত্রে ১/২ × ১/২ × ১/২ = ১/৮, চারচনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার সংখ্যা হলো ১/২-কে পরপর চারবার গুণ করলে যা হয়, তাই। তাহলেই দেখছ প্রত্যেক বারেই সম্ভাবনার সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে।"

"তাহলে ১০ জন পথিকের ক্ষেত্রে এটা কি হবে?"

"তুমি বলছ, প্রথম দশজন পথিকেরই পুরুষ হবার কতটা সম্ভাবনা? এর জন্যে ১/২-কে দশবার গুণ করলে যা হয় সেটা বের করতে হবে। তা হবে ১/১০২৪। তার মানেই হলো, তুমি যদি এক রুবল বাজি ধরে বলো এটা ঘটবে, আমি তাহলে ১০০০ রুবল বাজি ধরে বলতে পারি এটা ঘটবে না।"

উপস্থিত সবার ভেতর একজন চিৎকার করে বলল, "বাজিটাতে লোভ লাগছে! এক রুবল বাজি রেখে হাজার রুবল জিততে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার।"

"কিন্তু ভুলে যেও না, জেতবার সম্ভাবনাটা কিন্তু হাজারে একবার মাত্র।"

"কুছ্ পরোয়া নেই, আমি বরং হাজার রুবলের জন্যে এক রুবল বাজি ধরতেই রাজি আছি। এই বলে যে পথিকদের প্রথম একশো জনই হবে পুরুষ।"

"এক্ষেত্রে সম্ভাবনটা যে কত কম তা বুঝতে পারছ?"

"এটা বোধহয় দশ লক্ষে একবারের মতন বা সেরকম কিছু হবে।"

"না এটা এত কম যে হিসেবেও চলে না। ২০ জন পথিক হলে সম্ভাবনা হলো দশ লক্ষে একবার, ১০০ জন হলে হবে... আচ্ছা একটু দাঁড়াও। একটা কাগজে হিসেবটা

Scanned by CamScanner

কয়ে বেশি। ১০০ জনে সম্ভাবনাটা হলো... আরে বাব্বাঃ, ১:১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০।"

"এই তো মোটা!"

"খুব কম মনে হচ্ছে নাকি? সমুদ্রেও এত কোটা জল নেই, এমনকি এর ১০০০ ভাগের এক ভাগও নয়।"

"হ্যাঁ, সংখ্যাটা খুবই বিরাট বটে! তা আমার রুবলের বদলে তুমি কত টাকা রাখছ?"

"হি? হি!... সবকিছু, আমার যা কিছু আছে।"

"সবকিছু, বড় বেশি হয়ে গেল। তোমার সাইকেলটাই রাখো। আমি ঠিকই জানি তোমার সে সাহস নেই।"

"আমার সাহস নেই? আচ্ছা, এসো না! আমার সাইকেলই বাজি ধরলাম। এতে কোনো ঝুঁকিই নেয়া হচ্ছে না আমার!"

"আমিও না। একটা রুবল খুব বেশি কিছু নয়! তবুও আমি জিতলে পাব একটা সাইকেল, আর তুমি জিতলে যা পাবে তা প্রায় কিছুই না।"

"কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তুমি কখনোই জিতবে না? সাইকেলটা তুমি কিছুতেই পাবে না, আর তোমার রুবলটা তো প্রায় আমার পকেটেই এসে গেছে।"

"এরকম করো না!" অঙ্কনবিসের বন্ধুটি এবার যোগ দিল কথায়, "একটা রুবলের বদলে বাজি ধরছ একটা সাইকেল? পাগল নাকি?"

অঙ্কনবিস বন্ধুটিকে বলল, "তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে এক রুবল বাজি ধরাও বোকামি। একেবারে নিশ্চিত হার হবে। এ তো স্রেফ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেয়া।"

"তবু একটা সম্ভাবনা তো আছে!"

"হ্যাঁ, সারা সমুদ্রে এক বিন্দু জলের মতন—সত্যি বলতে দশটা সমুদ্রে এক বিন্দুর মতন। কত বড় সুযোগ। একটা সম্ভাবনার জন্যে দশটা সমুদ্রই বাজি রাখছি আমি। আমি জিতব একেবারে দুই আর দুইয়ে চার-এর মতোই নিশ্চয়।"

একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক মাঝখানে বলে উঠলেন, "তুমি যে একেবারে কল্পনার গা ভাসিয়ে দিচ্ছ!"...

"আচ্ছা প্রফেসর, আপনি কি সত্যিই মনে করেন ওর কোনো সুযোগ আছে জেতবার?"

"তোমরা কি ভাবছ না যে সব ঘটনাই ঘটা সম্ভব নয়? সম্ভাবনার এই হিসেবটা কখন ঠিক হয়? যখন বিভিন্ন রকমই ঘটার সম্ভানা থাকে, তাই না? এই দেখো না... আচ্ছা যাক, শোনো তো তোমরা। তোমাদের ভুলটা এবার বুঝতে পারবে বোধহয়। সৈন্যদের ব্যান্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?"

Scanned by CamScanner

"তা পাচ্ছি... এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি...?" তরুণ অঙ্কনবিসটি বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওর মুখে একটা ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল, তাড়াতাড়ি সে ছুটে গেল জানালার দিকে।

"ঠিক," দুঃখের সঙ্গেই বলল সে, "বাজিটা আমিই হারলাম। গেল সাইকেলটা..."

এক মুহূর্ত পরেই আমরা দেখলাম আমাদের জানালার সামনে দিয়ে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য কুচকাওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে।

৪৮. আমাদের চারপাশে দানবীয় সংখ্যাগুলো

দানবীয় সংখ্যাগুলোকে বের করতে হলে খুব দূরে যাবার দরকার নেই। সবই রয়েছে আমাদেরই চারপাশে। এমনকি আমাদের দেহের ভেতরেও। কি করে তাদের চিনতে হবে সেইটাই জানা দরকার। মাথার উপরের আকাশ, পায়ের নিচের বালুরাশি, চারপাশের বাতাস, আমাদের দেহের রক্ত—সবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দৈত্যের মতন সব সংখ্যা।

আকাশের বিরাট সংখ্যাগুলো বেশিরভাগ লোকের কাছেই অজানা নয়। আকাশে তার সংখ্যাই হোক, তাদের পরস্পরের ভেতরকার বা পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বই হোক বা তাদের আয়তন, ওজন বা বয়স যাই হোক—প্রত্যেক ক্ষেত্রের সংখ্যাগুলোই আমাদের কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয়। মানুষ যে 'জ্যোতিষিক সংখ্যা' কথাটা বার করেছে তা তো আর শুধু শুধু নয়। কিন্তু কেউ কেউ হয়তো এটা ভাবতেও পারবে না যে, এই আকাশের যেসব জিনিসকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'ছোট' বলে আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে যদি মানুষের অভ্যাসের দিক থেকে বিচার করা যায়, তাহলে সত্যি সত্যিই দৈত্যের মতো বিরাট হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সৌরজগতে কতগুলো গ্রহ আছে যাদের ব্যাস মাত্র কয়েক কিলোমিটার। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সবসময় বিরাট বিরাট সংখ্যা নিয়ে কারবার করেন বলে এদের বলেছেন 'ছোট'। কিন্তু আকাশের বড় বড় জিনিসগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে তবেই তাদের 'ছোট' বলে মনে হবে। আমাদের দৃষ্টিতে তারা মোটেই 'ছোট' নয়। তিন কিলোমিটার ব্যাসের একটি ' ছোট' গ্রহের কথাই ধরা যাক। জ্যামিতির সাহায্যে এই হিসেব করা মোটেই কঠিন নয় যে এর উপরিভাগের আয়তন ২৮ বর্গকিলোমিটার বা ২,৮০,০০,০০০ বর্গমিটারের সমান। এক বর্গমিটার জায়গায় সাত জন লোক স্বচ্ছন্দে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তাহলেই দেখতে পাচ্ছ এই ছোট্ট গ্রহের ওপরেই ১৯,৬০,০০,০০০ জন লোক দাঁড়িয়ে থাকবার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে।

যে বালুরাশির ওপর দিয়ে আমারা হেঁটে যাই তাও দানবীয় সংখ্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। সমুদ্রতীরের বালুরাশির মতোই অসংখ্য কথটি তো আর শুধু শুধু আসেনি! দেখা যাচ্ছে, পুরনো দিনের লোকেরা বালুকণার সংখ্যাকে ছোট করে দেখতেন। তাঁরা ভাবতেন আকাশে যত তারা আছে বালুকণার সংখ্যাও ঠিক তত। প্রাচীনকালে কোনো টেলিস্কোপ ছিল না, তাই এক গোলার্ধে মানুষ খালি চোখে দেখতে পেত প্রায়

Scanned by CamScanner

৩৫০০ তারা। সমুদ্রতীরের বালুরাশি খালি চোখে যত তারা দেখা যায় তার কোটি কোটি গুণ বেশি।

যে বাতাসে আমরা নিশ্বাস নিই তার ভেতরও এমনি সংখ্যা লুকিয়ে আছে। এর প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে আছে ২,৭০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ 'অণু'।

সংখ্যাটা যে কত বড় তা কল্পনা করাও অসম্ভব। পৃথিবীতে এত মানুষ থাকলে তাদের উপযুক্ত জায়গাই পাওয়া যেত না। সত্যি সত্যিই ভূপৃষ্ঠে সমস্ত মহাদেশ আর সমুদ্র ধরে নিলে আছে ৫০ কোটি বর্গকিলোমিটার। একে যদি বর্গমিটারে

ভাঙা যায়, তাহলে দাঁড়াবে ৫০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ বর্গমিটার।

এবার ২,৭০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০-কে এই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাক। উত্তর হলো ৫৪,০০০। আর এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে প্রত্যেক বর্গমিটারের ভাগে ৫০,০০০-এরও বেশি লোক পড়ছে!

আমরা বলেছি যে প্রত্যেক মানুষই তার ভেতরে দৈত্যের মতো বিরাট সংখ্যা বহন করে চলেছে। সেটা হলো রক্ত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এক ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করলে আমরা এক বিরাট সংখ্যার লোহিত কণিকা দেখতে পাব। এরা হলো চাকতির মতো, মাঝখানটা চাপা।

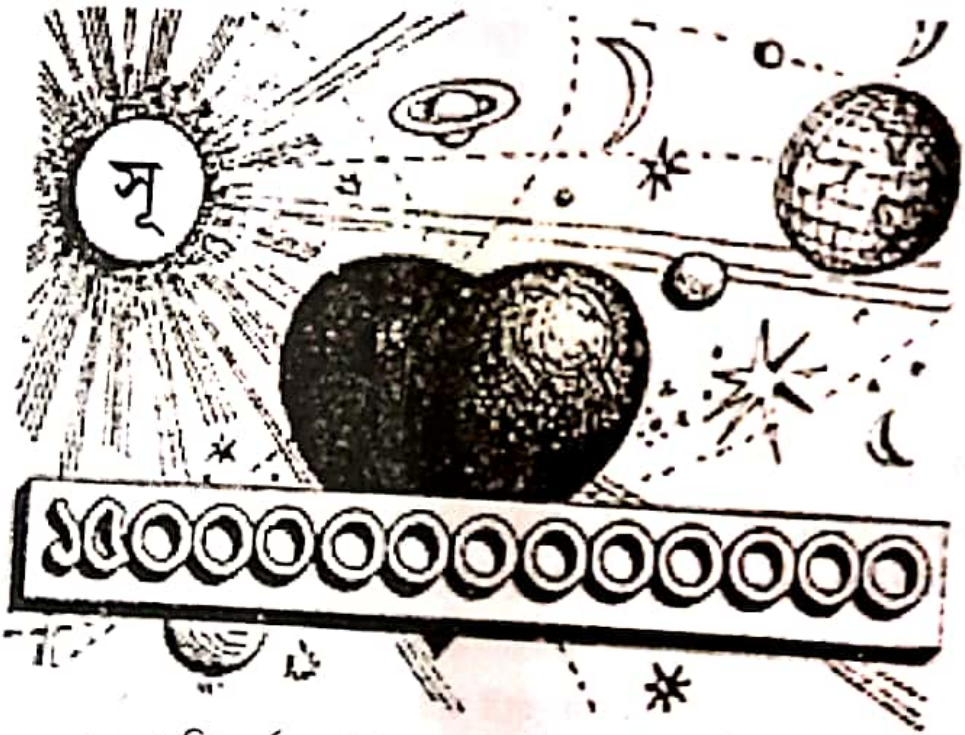

২০ নং ছবি। পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সার বাঁধা লোহিত কণিকার সুতো দিয়ে তিনবার পৃথিবীর চারদিকে পাক দেওয়া যায়।

তাদের প্রত্যেকের আকৃতিই প্রায় সমান, ব্যাস ০.০০৭ মিলিমিটার, আর ০.০০২ মিলিমিটার পুরু। ১ ঘন মিলিমিটারের মতো ছোট এক ফোঁটা রক্তে অনেক অনেকগুলো

Scanned by CamScanner

কণিকা রয়েছে—তাদের সংখ্যা ৫০ লক্ষ। মানুষের শরীরে কত কণিকা আছে? একটা মানুষের শরীরের যত কিলোগ্রাম ওজন, শরীরে রক্তের পরিমাণ তার ১৪ ভাগের চেয়ে কিছু কম লিটার। ধরা যাক, লোকটির ওজন যদি হয় ৪০ কিলোগ্রাম, তাহলে তার শরীরে আছে প্রায় ৩ লিটার (বা ৩০ লক্ষ ঘন মিলিমিটার) রক্ত। খুব সহজ একটা হিসেব করলেই দেখা যাবে, তার শরীরে আছে ৫০,০০,০০০ × ৩০,০০,০০০ = ১,৫০,০০,০০,০০,০০,০০০ লোহিত কণিকা।

একবার ভাব তো! ১৫,০০,০০০ কোটি লোহিত কণিকা! এদের যদি সার বেঁধে রাখা যায় তাহলে কণিকার সুতোটা কত বড় হবে? সেটা হিসেব করা কঠিন নয় মোটেই : ১,০৫,০০০ কিলোমিটার, অর্থাৎ পৃথিবীর বিষুবরেখার চারদিকে কয়েক পাক জড়িয়ে রাখা যায়, এটা এমন লম্বা, এর ১,০০,০০০ : ৪০,০০০ = ২.৫ গুণ। যদি উপযুক্ত ওজনের কোনো মানুষের কথাই ধরা যায়, তাহলে লোহিত কণিকার এই শেকল দিয়ে ৩ বার পৃথিবীকে জড়ানো চলবে।

এই ছোট্ট লোহিত কণিকাগুলো আমাদের দেহের অতি প্রয়োজনীয় কাজ করে। তারা শরীরের সমস্ত অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। রক্ত যখন ফুসফুসের ভেতর দিয়ে যায় তখন তারা অক্সিজেন শুষে নেয়, তারপর রক্তস্রোত যখন তাদের পৌঁছে দেয় আমাদের কোষকলার ভেতরে, তখন ফুসফুস থেকে বহু দূরের সেই অংশে তারা নিয়ে যায় সেই অক্সিজেন।

কণিকাগুলো যত ছোট হবে আর সংখ্যায় যত বেশি হবে তাদের কাজও ততই ভালোভাবে চলবে। কারণ তাহলে তাদের ত্বকের আয়তনটা বেশি হয় আর এই ত্বকের মধ্য দিয়েই তো তারা অক্সিজেন শুষে নিতে বা ছেড়ে দিতে পারে। হিসেব করলে দেখা যাবে এদের ত্বকের মোট আয়তন মানুষের বাইরের ত্বকের আয়তনের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এটা ৪০ মিটার লম্বা আর ৩০ মিটার চওড়া, অর্থাৎ প্রায় ১২০০ বর্গমিটারের সমান। এখন তাহলে বুঝতে পারছ জীবিত প্রাণীর দেহে যত বেশি সম্ভব লোহিত কণিকা থাকা কতটা দরকারি। এরা আমাদের শরীরের চেয়েও ১০০গ গুণ বেশি আয়তনের জায়গা দিয়ে অক্সিজেনকে শুষে নেয়, তারপর তা শরীরের অন্য অংশে নিয়ে যায়।

একজন মানুষ মোট যতটা পরিমাণ খাবার খায় তাও একটা দানবীয় সংখ্যা বৈকি (জীবনের দৈর্ঘ্য যদি গড়ে ৭০ বছর করে ধরা যায়)। একজন মানুষ তার সারা জীবনে যত টন জল, রুটি, মাংস, পশুপাখি, মাছ, শাকসব্জি, ডিম, দুধ ইত্যাদি খায় তা চালান করতে রীতিমতো একটা ট্রেন লেগে যাবে। সত্যিই, এটা বিশ্বাস করতে বেগ পেতে হয় যে একবারে না হলেও একজন মানুষ একটা ট্রেন ভর্তি জিনিস তার পেটে চালান করতে পারে।

Scanned by CamScanner

৪৯. পদক্ষেপ দূরত্বের হিসেব

আমাদের কাছে তো আর সবসময়ই গজ-কাঠি থাকে না। কি করে মোটামুটিভাবে দূরত্ব হিসেব করা যায়, তা জানা থাকলে সুবিধাই হবে।

মনে করো, তুমি যখন পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছ, তখন দূরত্ব হিসেব করার সবচেয়ে সোজা উপায় হলো পদক্ষেপ গোনা। এটা করতে তোমার পদক্ষেপের দূরত্ব জানা থাকা চাই। অবশ্য সবসময়ই যে সমান দূরে দূরে পা পড়বে তা নয়; তাছাড়া উৎসেমতো ছোটি ছোটি বা লম্বা লম্বা পা ফেলা যায়। তবে মোটামুটিভাবে পা ফেলার দূরত্ব প্রায় সমান, আর তোমার যদি এটা জানা থাকে, তাহলে যে কোনো দূরত্বই হিসেব করে ফেলতে পারবে।

প্রথমে তোমার পদক্ষেপের মোটামুটি দূরত্ব হিসেব করতে হবে। এটা অবশ্য মাপবার যন্ত্র ছাড়া করার উপায় নেই।

একটা ফিতে নিয়ে ২০ মিটার পর্যন্ত সেটাকে বিছাও। তারপর সেটাকে সরিয়ে নিয়ে ঐ দূরত্বটা পার হতে তোমার কতবার পা ফেলতে হয় তা দেখো। এমন হতে পারে যে, হিসেবটা হলো পা আর কিছু ভগ্নাংশ। যদি ভগ্নাংশটা ১/২-এর কম হয়, তাহলে তা হিসেবের মধ্যে আনবার দরকার নেই। যদি ১/২-এর বেশি হয়, তাহলে সেটাকে পুরো একটা সংখ্যা হিসেবেই গোনো। এরপর ২০ মিটারকে পদক্ষেপের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই মোটামুটি পদক্ষেপের মাপ পেয়ে যাবে। উত্তরটাকে মনে করে রাখো।

পদক্ষেপের হিসেব যাতে হারিয়ে না যায়, বিশেষত যখন বেশি দূরত্ব হিসেব করতে হয়, তখন সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ১০ পর্যন্ত গোনা, তারপর বাঁ হাতের একটা আঙুল ভাঁজ করে রাখা। যখন সবগুলো আঙুল ভাঁজ করা হয়ে যাবে, অর্থাৎ তুমি যখন ৫০ পা চলে গেছ, তখন ডান হাতের একটা আঙুল ভাঁজ করো। এভাবে তুমি ২৫০ পর্যন্ত গুনতে পারবে। তারপর আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। শুধু এটা ভুললে চলবে না যে তোমার ডান হাতের আঙুল তুমি মোট কতবার বাঁকিয়েছ। ধরা যাক, তোমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে ডান হাতের সমস্ত আঙুল তুমি পুরোপুরি দু'বার বাঁকিয়েছ, তারপর ডান হাতে-বাঁকিয়েছ তিন আঙুল আর বাঁ হাতে চার আঙুল, তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তুমি মোট গিয়েছ :

$$২ \times ২৫০ + (৩ \times ৫০) + (৪ \times ১০) = ৬৯০ \text{ পা}।$$

এর সঙ্গে অবশ্য শেষ আঙুল ভাঁজ করার পর অল্প আরও কয়েক পা যদি তুমি গিয়ে থাকো, তা যোগ দিতে হবে।

আচ্ছা এই দেখো, একটা পুরনো নিয়ম : একজন বয়স্ক লোকের মোটামুটি পদক্ষেপ হলো তার চোখ থেকে পায়ের বুড়ো আঙুল যতটা তার অর্ধেক।

হাঁটবার গতি সম্পর্কে আর একটা পুরনো নিয়ম : মানুষ তিন সেকেন্ডে যত পা যাবে, এক ঘণ্টায় যাবে ঠিক তত কিলোমিটার। কিন্তু পদক্ষেপের বিশেষ একটি মাপ থাকলেই

Scanned by CamScanner

এটা সত্যি হবে, আর পদক্ষেপটা বড় হলেই হিসেবটা খাটবে। যদি পদক্ষেপের বিস্তার হয় প মিটার, আর তিন সেকেন্ডে পদক্ষেপের সংখ্যা হয় ন, তাহলে তিন সেকেন্ডে মানুষ যাবে ন প মিটার, আর এক ঘণ্টায় (৩৬০০ সেকেন্ডে) যাবে ১২০০ ন প মিটার বা ১.২ ন প কিলোমিটার। এই দূরত্ব যদি তিন সেকেন্ডের পদক্ষেপের সংখ্যার সমান হয়, তাহলে এই সমীকরণটা আসছে : ১.২ ন প = ন বা ১.২ প = ১।

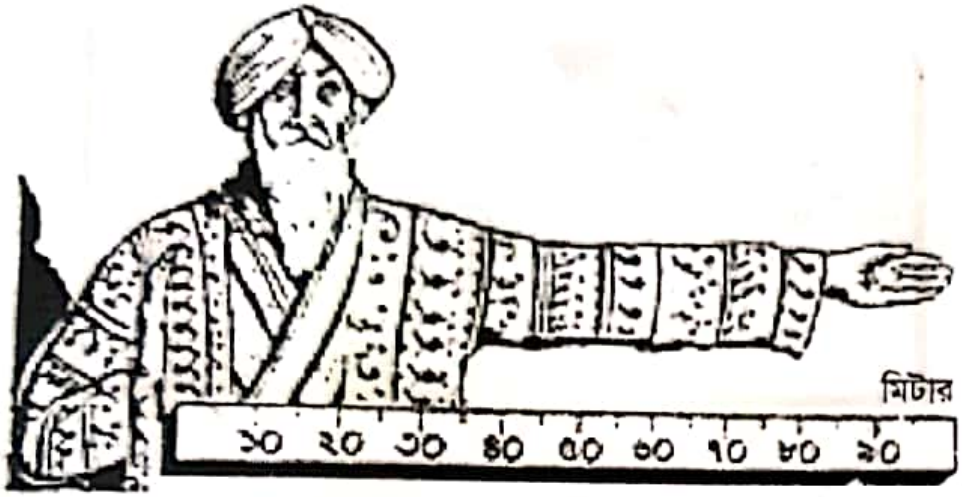

ছবি

২১ নং ছবি। এক হাত লম্বা করে দিয়ে হাতের আঙুল থেকে অন্য দিকের কাঁধ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হবে প্রায় এক মিটার

অর্থাৎ :

$$প = ০.৮৩ \text{ মিটার}$$

মানুষের পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য যে তার উচ্চতার ওপর নির্ভর করে এ নিয়মটা ঠিক। দ্বিতীয় যে নিয়মটা আমরা এমনি করে দেখলাম, তা কেবল প্রমাণ মাপের মানুষের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে মানুষ প্রায় ১.৭৫ মিটার লম্বা, তার ক্ষেত্রেই সত্যি।

৫০. জীবন্ত মাপকাঠি

হাতের কাছাকাছি মাপ নেবার কোনো যন্ত্রপাতি না থাকলে এই নিয়মটা দিয়ে প্রমাণ আকারের জিনিস মাপ করা চলে। এক হাত লম্বা করে দিয়ে হাতের আঙুল থেকে অন্য দিকের কাঁধ পর্যন্ত একটা দড়ি বা কাঠি রাখো।

(২১ নং ছবি) পূর্ণবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এর দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১ মিটার। আঙুল দিয়ে (মোটামুটিভাবে) মিটার মাপবার আরও একটা উপায় আছে। তর্জনি আর বুড়ো আঙুল যতটা পারা যায় ফাঁক করলে তাদের দূরত্ব হয় প্রায় ১৮ সেন্টিমিটার, আর এইরকম ছয়বার হলেই প্রায় ১ মিটার হয়ে যাবে (২২ নং ছবি)।

Scanned by CamScanner

এগুলো থেকে 'খালি হাতে' মাপা শেখা যায়। এজন্যে নিজের হাতের চেটোর মাপটা মনে রাখলেই চলবে।

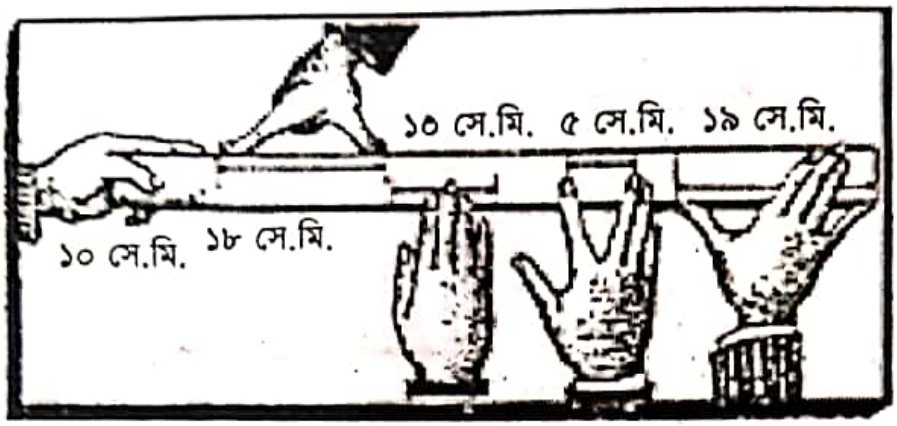

২২ নং ছবি। মাপ নেবার ফিতে ব্যবহার না করে মাপার জন্যে নিজের হাতের কি কি মাপ জানা দরকার।

প্রথমে হাতের চেটোর প্রস্থ জানতে হবে—২২-খ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে এটা সাধারণত ১০ সেন্টিমিটার। তোমারটা হয়তো এর চেয়ে বড় বা ছোট। কতটা তফাৎ তা তোমাকে জেনে রাখতে হবে। তারপর জানতে হবে তর্জনি আর মধ্যমাকে যতটা সম্ভব ফাঁক করলে তাদের দূরত্ব কত হয় (২২-গ নং ছবি)। তর্জনি বুড়ো আঙুলের গোড়া থেকে কতটা (২২-ঙ নং ছবি) লম্বা তা জেনে রাখাও খুব কাজের হবে। সবশেষে মেপে রাখো, যতটা সম্ভব ফাঁক করলে বুড়ো আঙুল আর কনিষ্ঠার দূরত্ব কত হয় (২২-ঘ নং ছবি)।

এই 'জীবন্ত মাপকাঠি' ব্যবহার করে তোমরা ছোট ছোট জিনিসের মোটামুটি মাপ বের করতে পারবে।

Scanned by CamScanner

এই পরিচ্ছেদের প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে খুব ভালো জ্যামিতি জানবার দরকার নেই। গণিতের এই বিভাগটি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেই যে কেউ এগুলো করতে পারবে। এখানে যে এক সারি ধাঁধা দেয়া হচ্ছে একজন তা দিয়েই বুঝতে পারবে সত্যিই জ্যামিতি তার কিছু জানা আছে কি-না। জ্যামিতিক আকৃতিগুলোর বৈশিষ্ট্য জানাই আসল জ্ঞান নয়—জানতে হবে বাস্তব সমস্যায় সেটাকে কি করে কাজে লাগাতে হবে। যে লোকগুলো ছুঁড়তে জানে না, তার বন্দুক কোন কাজে লাগবে?

পাঠক, তোমরাই দেখো না, এই জ্যামিতিক চাঁদমারীতে কতগুলোকে তোমরা ঠিক নিশানায় লাগাতে পারো।

৫১. ঠেলাগাড়ি

গাড়ির সামনের ধুরোটা পেছনেরটার চাইতে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় কেন?

৫২. বিবর্ধক কাচের মধ্য দিয়ে

যে কাচ দিয়ে জিনিসকে চার গুণ বড় দেখায় তার ভেতর দিয়ে দেখলে ১.৫ কোণকে কত বড় দেখাবে (২৩ নং ছবি)?

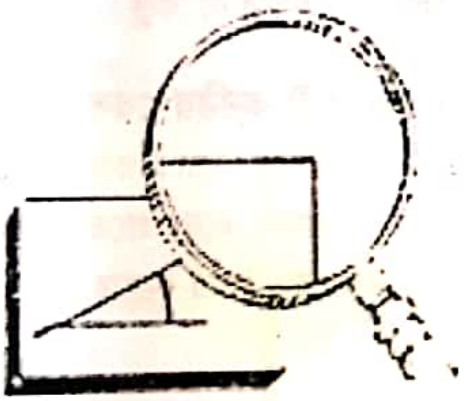

২৩ নং ছবি। কোণকে কত বড় দেখাবে?

৫৩. কতগুলো ধার?

প্রশ্নটা হয়তো খুব বোকার মতো মনে হবে, আর নয়তো মনে হবে খুবই চালাকির প্রশ্ন :

ছয়-কোণওয়ালা একটা পেন্সিলের ক'টা ধার থাকে?

উত্তরটা দেখার আগে ভালো করে ভেব কিন্তু।

Scanned by CamScanner

৫৪. অর্ধচন্দ্র

একটা অর্ধচন্দ্রের আকৃতিকে (২৪ নং ছবি) মাত্র দুটো সরলরেখা টেনে ছয় ভাগে ভাগ করতে পারো?

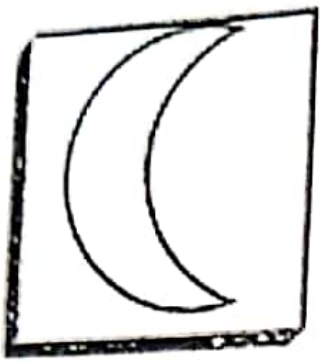

২৪ নং ছবি। অর্ধচন্দ্র।

২৫ নং ছবি। ১২টি দেশলাই কাঠির ক্রুশ।

৫. দেশলাই কাঠির খেলা

১২টা কাঠি দিয়ে তো তোমরা একটা ক্রুশের মতো করতে পারোই (২৫ নং ছবি)। দেশলাই কাঠি দিয়ে বর্গক্ষেত্র তৈরি করলে তার পাঁচটা ক্ষেত্রের সমান হবে এর আয়তন।

কাঠিগুলোকে কী এমন করে সাজাতে পারো, যাতে এর পরিমাপ চারটে বর্গক্ষেত্রের পরিমাপের সমান হয়?

কোনো মাপন-যন্ত্র ব্যবহার করা চলবে না কিন্তু।

৫৬. আরও একটা দেশলাই কাঠির খেলা

তোমরা আটটা দেশলাই কাঠি দিয়ে অনেক রকম ক্ষেত্র তৈরি করতে পারো। ২৬ নং ছবিতে তার কয়েকটা দেখানো হলো। এদের প্রত্যেকটির মাপ আলাদা। এটা আটটা দেশলাই কাঠি দিয়েই সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

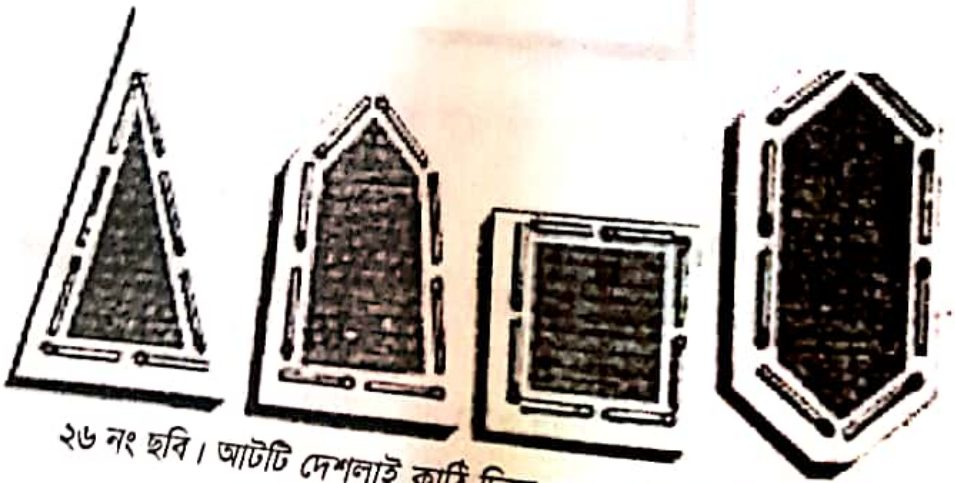

২৬ নং ছবি। আটটি দেশলাই কাঠি দিয়ে সম্ভাব্য বৃহত্তম ক্ষেত্র তৈরি।

Scanned by CamScanner

৫৭. মাছির রাস্তা

২৭ নং ছবি। মাছিকে মধুর ফোঁটার পথ বলে দাও

একটা বেলনাকার পাত্রের ভেতরের দেয়ালে, উপরের গোলাকার মাথা থেকে তিন সেন্টিমিটার নিচে এক ফোঁটা মধু আছে। এর ঠিক উল্টো দিকে, বাইরের দেয়ালে আছে একটা মাছি (২৭ নং ছবি)। মধুর কাছে পৌঁছবার সবচেয়ে ছোট রাস্তাটা ঐ মাছিটাকে দেখাতে হবে।

পাত্রটির ব্যাস ১০ সেন্টিমিটার আর এর উচ্চতা ২০ সেন্টিমিটার।

মাছিটা নিজেই পথ খুঁজে নেবে এমন মনে করো না, তাহলে তো সমাধানটা সোজাই হয়ে গেল। এটা করতে হলে জ্যামিতি ভালো করে জানতে হবে, আর সেটা তো একটা মাছির ক্ষমতার বাইরে।

৫৮. ছিপি দিতে পারো একটা?

তোমাকে একটা তক্তার টুকরো দেয়া হলো, তাতে আছে তিনটে ফুটো—একটা বর্গক্ষেত্রের মতো, একটা ত্রিকোণ আর একটা গোলাকার। এমন একটা ছিপি দিতে পারো যা তিনটে ফুটোতেই লাগবে (২৮ নং ছবি)?

২৮ নং ছবি। তিনটে ফুটোতেই লাগার মতো একটা ছিপি খোঁজা।

২৯ নং ছবি। এই ফুটোগুলোর জন্যে একটা ছিপি হতে পারে কি?

৩০ নং ছবি। এই তিনটি ফুটোর জন্যে একটা ছিপি বানানো যায় কি?

Scanned by CamScanner

৫৯. দ্বিতীয় ছিপি

যদি আগের প্রশ্নটার সমাধান করে থাকো, তবে ২৯ নং ছবিতে যে ফাঁকগুলো দেখানো আছে তার জন্যে একটা ছিপি বের করতে চেষ্টা করো তো?

৬০. তৃতীয় ছিপি

ঐ ধরনেরই আরও একটা প্রশ্ন : ৩০ নং ছবিতে দেখানো ফাঁকগুলোর জন্যে একটা ছিপি হতে পারে কি?

৬১. মুদ্রার খেলা

দুটো মুদ্রা নাও : ৫ কোপেক আর ২ কোপেক (২৫ মিলিমিটার আর ১৮ মিলিমিটার ব্যাসের যে কোনো দুটো মুদ্রা হলেই চলবে)। এরপর একটা কাগজে ২ কোপেক মুদ্রার পরিধির সমান গোল করে কেটে বাদ দাও।

৫ কোপেক মুদ্রাটা এই ফাঁকের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে কি?

এ ধাঁধাটায় কোনোই ফাঁকি নেই কিন্তু। এটা একেবারে জ্যামিতির প্রশ্ন।

৬২. মিনারের উচ্চতা

তোমাদের শহরে একটা খুব বড় মিনার আছে, কিন্তু এর উচ্চতা তোমার জানা নেই। অবশ্য এর একটা ফটো আছে তোমার কাছে। এর থেকে কি আসল উচ্চতাটা বের করা যায়?

৬৩. একই ধরনের ক্ষেত্র

৩১ নং ছবি। ভেতরের ও বাইরের ত্রিভুজ কি সদৃশ?

জ্যামিতিক সাদৃশ্য যারা বুঝতে পারো এই ধাঁধাটা তাদেরই জন্যে। এই দুটো প্রশ্নের উত্তর দাও :

(১) ৩১ নং ছবির দুটো ত্রিভুজ কি সদৃশ ত্রিভুজ?

(২) ৩২ নং ছবির বাইরের আর ভেতরের চতুর্ভুজগুলো কি সদৃশ?

৬৪. তারের ছায়া

রোদের দিনে একটা ৪ মিলিমিটার টেলিগ্রাফ তারের নিখুঁত ছায়া কত দূর পর্যন্ত দেখা যাবে?

Scanned by CamScanner

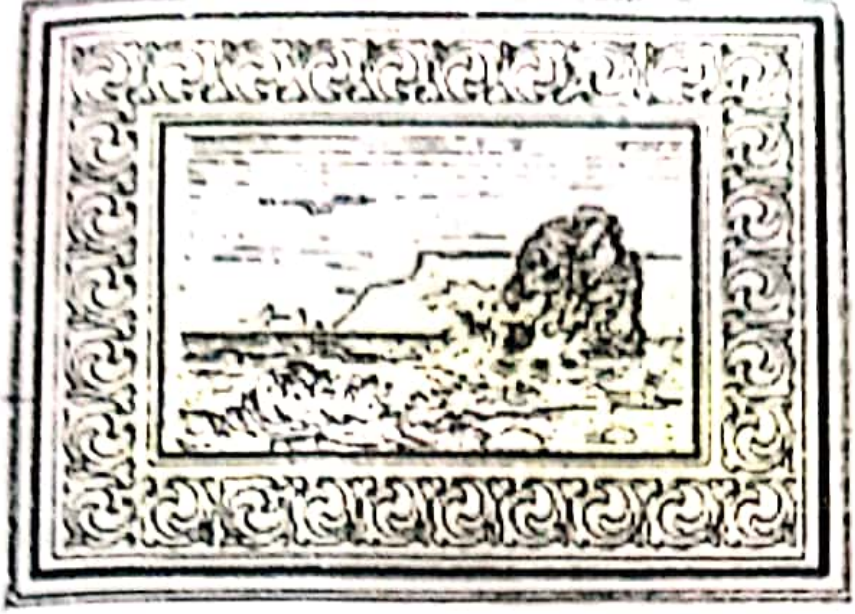

৩২ নং ছবি। বাইরের ও ভেতরের চতুর্ভুজগুলো কি সদৃশ?

৬৫. একটা ইট

একটা ঠিক মাপের ইটের ওজন হলো ৪ কিলোগ্রাম। এর চার ভাগের এক ভাগ আর একই জিনিস দিয়ে তৈরি একটা ছোট ইটের ওজন কত হবে?

৬৬. দৈত্য আর বামন

১ মিটার লম্বা একজন বেঁটে লোকের থেকে ২ মিটার লম্বা একজন লোকের ওজন প্রায় কত গুণ বেশি?

৬৭. দুটো তরমুজ

একজন লোক দুটো তরমুজ বিক্রি করছে। একটা আর একটা থেকে চার ভাগের এক ভাগ বড়, কিন্তু তার দাম দেড় গুণ বেশি। কোনটা কেনা লাভজনক (৩৩ নং ছবি)?

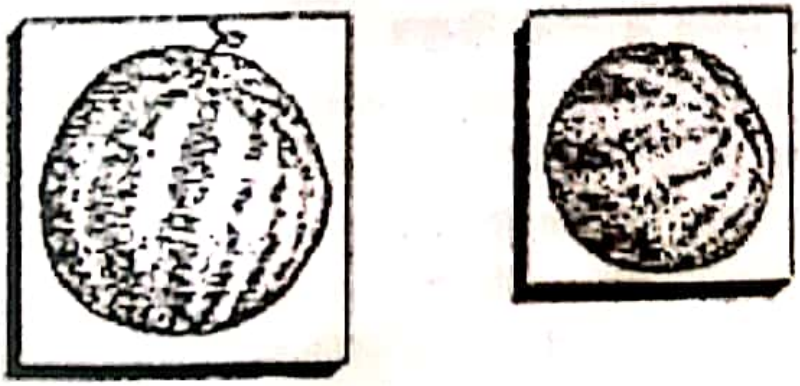

৩৩ নং ছবি। কোন তরমুজটা কেনা লাভজনক?

Scanned by CamScanner

৬৮. দুটো ফুটি

একই ধরনের দুটো ফুটি বিক্রি হচ্ছে। একটার পরিধি ৬০ সেন্টিমিটার, অন্যটার ৫০। প্রথমটার দাম দেড় গুণ বেশি। এর ভেতর কোনটা কিনলে বেশি লাভ হবে?

৬৯. একটা চেরি ফল

চেরি ফলের বীচির চারপাশের শাঁস বীচির মতোই পুরু। ধরে নেয়া যাক, চেরি ফল আর বীচি দুটোই গোল। মনে মনে হিসেব করে বলতে পারো চেরি ফলটার বীচির চেয়ে শাঁস কত গুণ বেশি?

৭০. আইফেল টাওয়ার

প্যারিসের ৩০০ মিটার উঁচু আইফেল টাওয়ার ৮০ লক্ষ কিলোগ্রাম ইস্পাত দিয়ে তৈরি। আমি এরই একটা ১ কিলোগ্রাম ওজনের প্রতিকৃতি তৈরি করতে দেব ঠিক করেছি।

এটা কত উঁচু হবে? একটা জলের গ্লাস থেকে বড় না ছোট হবে?

৭১. দুটো কড়াই

দুটো কড়াই একইরকম দেখতে আর সমান পুরু। একটার চাইতে অন্যটায় আট গুণ বেশি জিনিস ধরে।

ছোটটা থেকে বড়টার ওজন কত বেশি?

৭২. শীতকালে

এক ঠাণ্ডার দিনে একজন পূর্ণবয়স্ক লোক আর একটি বাচ্চা একইরকম পোশাক পরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

কার বেশি শীত লাগছে?

৫১-৭২ নম্বর বাঁধার উত্তর

৫১. প্রথম নজরে ধাঁধাটায় কোনো জ্যামিতির ব্যাপার আছে বলে মনেই হবে না। কিন্তু জ্যামিতি-জ্ঞানী সহজেই বুঝতে পারবে যে এর ভেতরে সমস্ত বিবরণের আড়ালে একটা জ্যামিতির সূত্র লুকিয়ে আছে। আসলে এটা একটা জ্যামিতির সমস্যা। জ্যামিতিকে বাদ দিয়ে এর কোনো সমাধান সম্ভব নয়। প্রশ্নটা হলো : গাড়ির সামনের চাকার ধুরো (অক্ষদণ্ড) কেন পেছনের চাকার ধুরো থেকে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়? সাধারণত দেখতে পাবে গাড়ির সামনের চাকাগুলো পেছনের চাকার চাইতে ছোট। জ্যামিতি থেকে পাচ্ছি যে একই

Scanned by CamScanner

দূরত্ব যেতে একটা ছোট পরিধির গোলককে একটা বড় পরিধির গোলকের চেয়ে বেশি ঘুরতে হবে। আর এ তো খুবই স্বাভাবিক যে সামনের চাকাটা যত বেশি ঘুরবে, তার ধুরোও তত তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাবে।

৫২. তোমরা যদি মনে করে থাকো যে বিবর্ধক কাচের জন্যে কোণটা বেড়ে $১\frac{১}{২} \times ৪ = ৬°$ হয়েছে তাহলে খুবই ভুল করছ। বিবর্ধক কাচ কোণের পরিমাপকে বাড়বে না। এটা সত্যি যে কোণ-মাপক চাপে দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এর ব্যাসার্ধও সমান অনুপাতে বাড়বে। ফলে কেন্দ্রীয় কোণের পরিমাপের কোনো পরিবর্তন হবে না। ৩৪ নং ছবি থেকে এটা ভালো বোঝা যাবে।

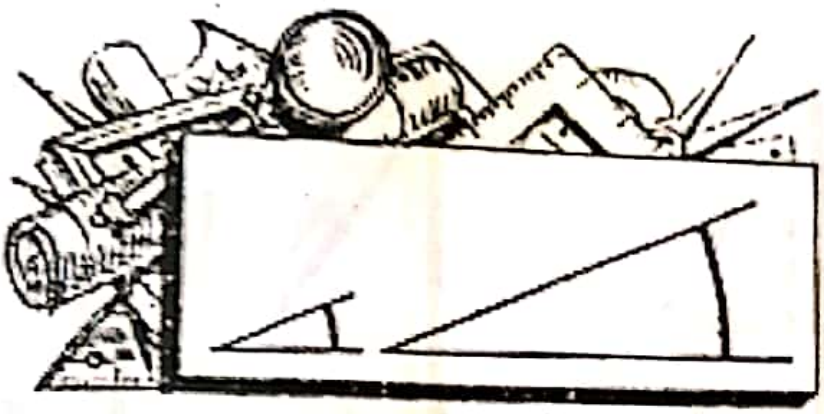

৩৪ নং ছবি

৫৩. ধাঁধাটিতে চালাকির কিছু নেই : কথার ভুল মানে করার ভেতরই আসল জিনিস রয়েছে। বেশিরভাগ লোকেরই বোধহয় ধারণা এই যে ছয়-কোণা পেন্সিলের ছ'টি ধার। তা ঠিক নয়। যদি পেন্সিল না চোখা করা হয়ে থাকে তাহলে হবে আটটি ধার : ছ'টি ধার আর ছোট দুটি প্রান্ত। যদি সত্যিই এর মাত্র ছ'টি ধার থাকত, তাহলে পেন্সিলটির চেহারা হতো একেবারে অন্যরকম—আয়তক্ষেত্রের মতো।

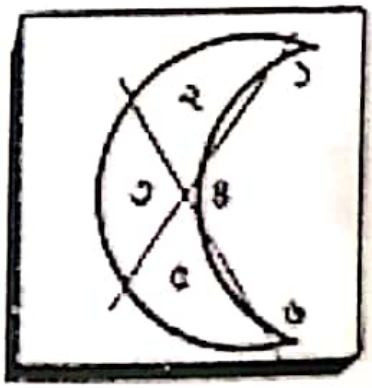

৩৫ নং ছবি

তাই পেন্সিলটিকে ছয় ধারওয়ালা না বলে ছয়কোণওয়ালা বলা ঠিক।

৫৪. ৩৫ নং ছবির মতো করে করতে হবে এটাকে। মোট ছ'টি অংশ হবে। সুবিধের জন্যে অংশগুলোতে নম্বর দেয়া হলো।

Scanned by CamScanner

৫৫. ৩৬ নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে দেশলাইয়ের কাঠিগুলোকে সেভাবে সাজাতে হবে। এর আয়তন একটি দেশলাই কাঠির মাপের বর্গক্ষেত্রের চার গুণ। ব্যাপারটা সত্যিই তাই। মনে মনে আমাদের ছবিটিকে পুরো ত্রিভুজাকৃতি করা যাক। একটা সমকোণী ত্রিভুজ হলো, যার ভূমি তিনটি দেশলাই কাঠির সমান, আর উচ্চতা হলো চারটে কাঠির সমান।*

এর ক্ষেত্রফল হলো ভূমির অর্ধেক আর উচ্চতার গুণফল : $১/২ \times ৩ \times ৪ =$ ৬টি দেশলাই কাঠির মাপের বর্গক্ষেত্রের সমান (৩৬ নং ছবি)। কিন্তু আমাদের ছবির আয়তন, ত্রিভুজের আয়তন থেকে দেশলাই কাঠির মাপের দুই বর্গক্ষেত্রের মাপ কম হচ্ছে। সুতরাং, এর আয়তন ঐরকম চার বর্গক্ষেত্রের সমান।

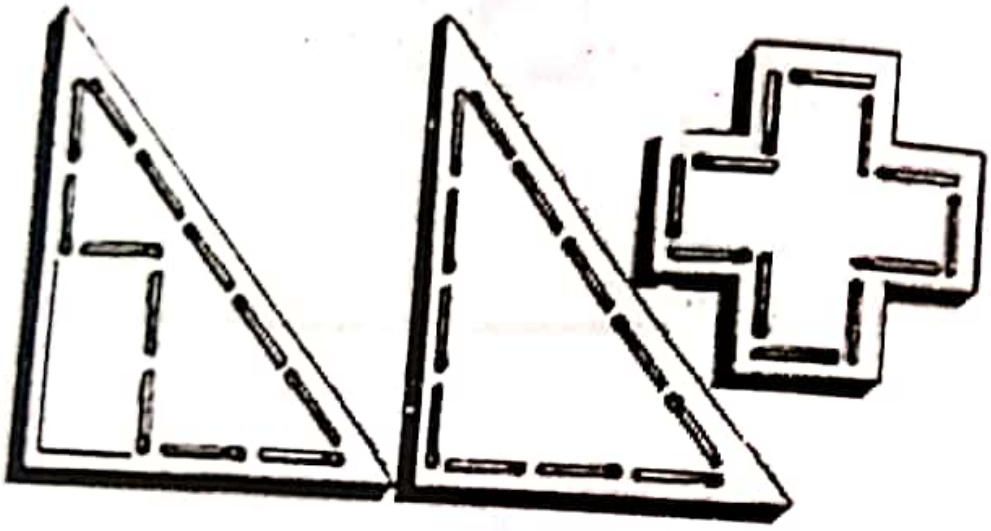

৩৬ নং ছবি

৫৬. সীমাবদ্ধ সমস্ত সমতলক্ষেত্রের মধ্যে বৃত্তই হলো সবচেয়ে বড়। অবশ্য দেশলাই কাঠি দিয়ে ঠিকঠাক বৃত্ত তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু আটটি দেশলাই কাঠি দিয়ে প্রায় বৃত্তের মতোই একটি ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। এটি একটি সুষম অষ্টভুজ হবে (৩৭ নং ছবি)।

এই সুষম অষ্টভুজই আমাদের অভিষ্ট সেই ক্ষেত্রটি। কেননা এরই ক্ষেত্রফল সবচেয়ে বেশি।

৫৭. এই সমস্যার সমাধান করতে হলে পাত্রটি লম্বালম্বি ফেলে খুলে চ্যাপ্টা করে ফেলতে হবে। এটা তখন একটা আয়তক্ষেত্র (৩৮ নং ছবি)। এর প্রস্থ ২০

---

* পাঠকদের ভেতর যাদের পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সঙ্গে পরিচয় আছে তারা বুঝতে পারবে আমাদের ছবিটি যে সমকোণী ত্রিভুজ তাতে কোনো সংশয় নেই : $৩^২ + ৪^২ = ৫^২$।

Scanned by CamScanner

সেন্টিমিটার আর দৈর্ঘ্য হবে পরিধির সমান, অর্থাৎ ১০ × ৩১/৭ = ৩১.৫ সেন্টিমিটার (প্রায়)। এখন এই আয়তক্ষেত্রে মাছি আর মধুর ফোঁটার অবস্থান চিহ্ন দেয়া যাক। মাছিটি আছে ক বিন্দুতে, ভূমি থেকে ১৭ সেন্টিমিটার দূরে। মধুর ফোঁটা আছে খ বিন্দুতে, ভূমি থেকে সমান উচ্চতায়, কিন্তু ক থেকে পাত্রের পরিধির অর্ধেকটা দূরে, অর্থাৎ ১৫ $\frac{৩}{৪}$ সেন্টিমিটার দূরে।

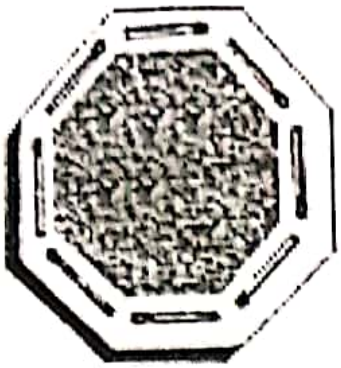

৩৭ নং ছবি

পাত্রের ভেতর যে বিন্দু পর্যন্ত মাছিকে উঠে এসে ভেতরে নামতে হবে তা এভাবে বের করতে হবে : খ বিন্দু থেকে (৩৯ নং ছবি) উপরের কিনারার উপর একটি লম্বরেখা এঁকে সেই রেখাকে সমান দূরত্বে টেনে বাড়িয়ে গেলাম।

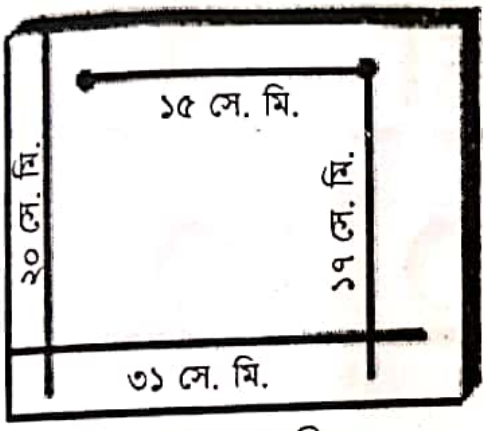

৩৮ নং ছবি

এবার আমরা পেলাম গ বিন্দু। একটা সরলরেখা টেনে ক বিন্দুর সঙ্গে গ-এর সংযোগ করা হলো। তাহলে ঘ হবে সেই বিন্দু যেখান থেকে মাছিকে কিনারা পার হয়ে পাত্রের ভেতর ঢুকতে হবে। ক ঘ খ হলো সবচেয়ে ছোট রাস্তা।

চ্যাপ্টা আয়তক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোট রাস্তাটি বের করে নেবার পর এটিকে আবার গোল করে পাত্রের মতন করে নিয়ে মধুর বিন্দুর কাছে পৌছতে মাছিটি কিভাবে এগিয়ে যায় তা দেখতে পারি (৪০ নং ছবি)।

এসব ক্ষেত্রে মাছিরা সত্যি সত্যিই এইরকম রাস্তায় যায় কি-না তা বলতে পারি না। ভালো নাক থাকায় মাছিদের পক্ষে সবচেয়ে ছোট রাস্তায় যাবার ক্ষমতা আছে। ক্ষমতার কথাই বলছি, সম্ভাবনার কথা নয়। জ্যামিতির জ্ঞান না থাকলে ভালো ঘ্রাণেন্দ্রিয় থাকাটাই যথেষ্ট নয়।

৫৮. ৪১ নং ছবিতে এইরকম একটা ছিপি দেখানো হয়েছ। দেখতে পাচ্ছ এটা সত্যিই চৌকোণা, তেকোণা এবং গোল, তিন-রকম ফুটোকেই বন্ধ করতে পারে।

Scanned by CamScanner

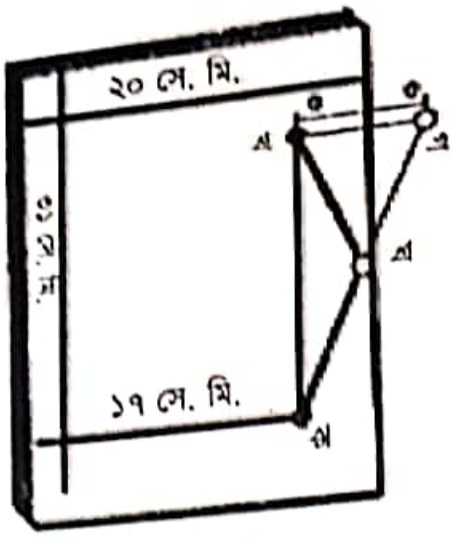

৩৯ নং ছবি

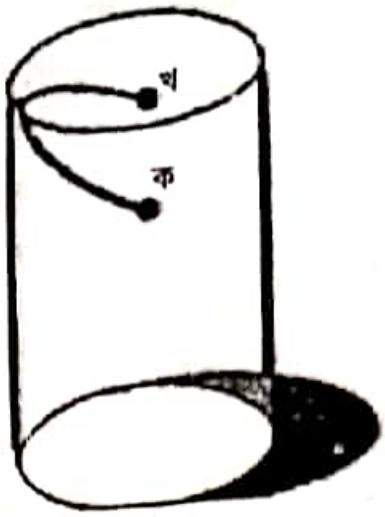

৪০ নং ছবি

৪১ নং ছবি

৪২ নং ছবি

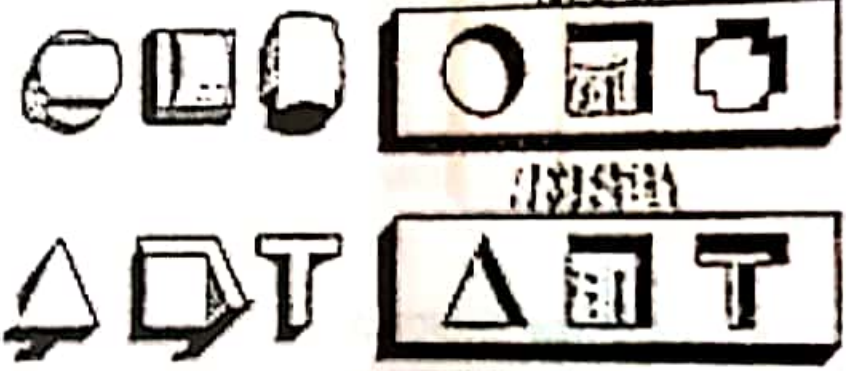

৪৩ নং ছবি

৫৯. ৪২ নং ছবিতে গোল, চৌকোণা এবং ক্রুশ আকারের ফুটো বন্ধ করতে পারে এমন আরও একটি ছিপি আছে। এর তিনটে দিকই দেখানো হয়েছে।

৬০. হ্যাঁ, এরকম ছিপিও হয়—এর সব ক'টা অংশ ৪৩ নং ছবিতে দেখতে পাবে।

৬১. অদ্ভুত মনে হলেও ছোট্ট ফুটো দিয়ে একটা ৫ কোপেক মুদ্রা গলানো সম্ভব। কাগজটাকে ভাঁজ করে ফেলে গোল ছিদ্রটিকে টেনে লম্বা করে (৪৪ নং ছবি), তার ভেতর দিয়ে ৫ কোপেক মুদ্রা গলিয়ে আনা যায়।

Scanned by CamScanner

৪৪ নং ছবি

এই কৌশলের কাজটা জ্যামিতি দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ১ কোপেক মুদ্রার ব্যাস হলো ১৮ মিলিমিটার। এর পরিধি বের করা কঠিন নয় : ৫৬ মিলিমিটারের অল্প একটু বেশি। সরু পথটার দৈর্ঘ্য এর অর্ধেক বা ২৮ মিলিমিটার। এখন ৫ কোপেক মুদ্রার ব্যাস হলো ২৫ মিলিমিটার। এটা ১.৫ মিলিমিটার পুরু হলেও ২৮ মিলিমিটারের সরু পথ দিয়ে বেশ গলে যেতে পারবে।

৬২. গম্বুজটির আসল উচ্চতা বের করতে হলে ফটোর ভিতরে এর উচ্চতা ও ভিতের মাপ ঠিকঠাক নিতে হবে। ধরা যাক, মাপগুলো হলো ৯৫ ও ১৯ মি.মি.। এরপর আসল গম্বুজের ভিতের মাপটা নাও। ধরা যাক, ভিতের প্রস্থ হলো ১৪ মিটার।

জ্যামিতি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে ফটোর গম্বুজ আর আসল গম্বুজ একই জিনিসের ভিন্ন অনুপাত। অর্থাৎ ফটোর গম্বুজের উচ্চতা আর ভিতের অনুপাত এবং আসল গম্বুজের উচ্চতা আর ভিতের অনুপাত সমান। প্রথম ক্ষেত্রে এটা হলো ৯৫ : ১৯, অর্থাৎ ৫। তাহলে গম্বুজের উচ্চতা ভিতের চাইতে ৫ গুণ বেশি।

সুতরাং আসল গম্বুজের উচ্চতা হবে : ১৪ × ৫ = ৭০ মিটার। অবশ্য, একটা 'কিন্তু' আছে। গম্বুজের উচ্চতা বের করতে হলে সত্যিকারের ভালো ফোটা চাই। অনভিজ্ঞসখের ফটোগ্রাফারের হাতে সাধারণত যা ওঠে তেমন বিকৃত ছবি হলে চলবে না।

৬৩. প্রায়ই এই দুটো প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ত্রিভুজগুলোই সদৃশ। সাধারণভাবে বলতে গেলে ছবির ফ্রেমের বাইরের এবং ভেতরের দিকে আয়তক্ষেত্রগুলো সদৃশ নয়। সদৃশ ত্রিভুজ হতে হলে অনুরূপ কোণগুলো সমান হলেই যথেষ্ট। এখানে যেহেতু বাইরের ত্রিভুজের বাহুগুলোর সঙ্গে ভেতরের ত্রিভুজের বাহুগুলি সমান্তরাল সুতরাং চিত্র দুটি সদৃশ। সদৃশ বহুভুজ হতে হলে কিন্তু তাদের কোণগুলো সমান হলেই (অথবা বাহুগুলো সমান্তরাল হলেই—অবশ্য ব্যাপারটা তাতে একই দাঁড়ায়) যথেষ্ট নয়। বহুভুজের বাহগুলোকে সমানুপাতিক হতে হবে। ছবির ফ্রেমের

Scanned by CamScanner

বাইরের এবং ভেতরের আয়তক্ষেত্রগুলোর মধ্যে একমাত্র বর্গক্ষেত্রে বেলায়ই (সাধারণত বয়সের ক্ষেত্রে) সদৃশ হওয়া সম্ভব। এছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে বাইরের এবং ভেতরের আয়তক্ষেত্রের

৪৫ নং ছবি

বাহুগুলো সমানুপাতিক নয়। সুতরাং চিত্রগুলো সদৃশ নয়। মোটা আয়তক্ষেত্রের মতো ফ্রেমগুলোতে এই সাদৃশ্যের অভাব আরও বেশি পরিষ্কার (৪৫ নং ছবি) বাঁ দিকের ফ্রেমের বাইরের বাহুগুলো আছে ২ : ১ অনুপাতে। ডান দিকের ফ্রেমে আছে পর্যায়ক্রমে ৪ : ৩ এবং ২ : ১ অনুপাতে।

৬৪. অনেকেই একথা শুনে আশ্চর্য হবে যে এই ধাঁধার সমাধান করতে পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব ও সূর্যের ব্যাস ইত্যাদি জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান দরকার।

একটা তারের নিখুঁত দৈর্ঘ্য কতটা হবে তা ৪৬ নং ছবির জ্যামিতিক চিত্র দিয়ে বের করা যেতে পারে। এটা খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে সূর্যের ব্যাস (১৪ লক্ষ কিলোমিটার) থেকে পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব

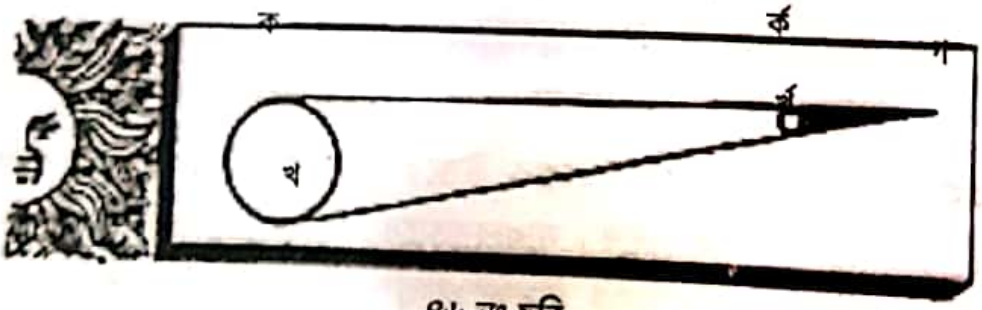

৪৬ নং ছবি

(১৫,০০,০০,০০০ কিলোমিটার) যতগুণ বেশি তারের ব্যাস থেকে তারের ছায়াও ততগুণ বড়। মোটামুটিভাবে, সূর্যের ব্যাস ও পৃথিবী এবং সূর্যের দূরত্বের অনুপাত প্রায় ১ : ১১৫। সুতরাং তারের নিখুঁত ছায়ার দৈর্ঘ্য হবে :

৪ × ১১৫ = ৪৬০ মিলিমিটার = ৪৬ সেন্টিমিটার

Scanned by CamScanner

নিখুঁত ছায়ার দৈর্ঘ্য এরকম নগণ্য মাপের হয় বলেই ছায়াটা মাটি বা দেয়ালের উপর সবসময় দেখা যায় না। আবছা দাগ যা দেখা যায় তা ছায়া নয়, উপচ্ছায়া।

এই ধরনের সমস্যার সমাধানের আর একটি পদ্ধতি ৭ নম্বর ধাঁধায় দেখানো হয়েছে।

৬৫. খেলার ইটের ওজন হবে ১ কিলোগ্রাম অর্থাৎ চার ভাগ কম—এরকম উত্তর দিলে তা একেবারে ভুল হবে। ছোট ইটটা আসল ইট থেকে কেবল দৈর্ঘ্যেই চার ভাগ কম নয়, প্রস্থে এবং উচ্চতায়ও চার ভাগ করে কম। সুতরাং এর ঘনফল এবং ওজনও ৪ × ৪ × ৪ = ৬৪ ভাগ কম। সুতরাং ঠিক উত্তর হবে : ৪০০০ : ৬৪ = ৬২.৫ গ্রাম।

৬৬. এই ধাঁধাটাও ঠিক উপরের ধাঁধার মতো। সুতরাং তোমাদের এটা ঠিকভাবে করা উচিত। মানুষের শরীর মোটামুটিভাবে সদৃশ। সুতরাং যদি কারও উচ্চতা দ্বিগুণ হয় তাহলে তার ওজন অন্যজনের ওজনের চাইতে দ্বিগুণ নয়, আট গুণ বেশি হবে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় যে মানুষটির কথা জানা যায় সে ছিল একজন অ্যালসেশিয়ান-২.৭৫ মিটার লম্বা, অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক উচ্চতা থেকে প্রায় ১ মিটার বেশি লম্বা। সবচেয়ে ছোট মানুষটি ছিল একজন লিলিপুটীয়। সে ছিল ৪০ সেন্টিমিটারের চেয়েও বেঁটে। তাহলে মোটামুটিভাবে বলা যায় ছোট মানুষটি অ্যালসেশিয়ানটির চাইতে ছিল সাত ভাগ খাটো। এদের মেপে সমান করতে হলে পাল্লার একদিকে চাপাতে হবে ৭ × ৭ × ৭ = ৩৪৩ জন বেঁটে মানুষ। অর্থাৎ বেঁটে মানুষদের দস্তুরমতো একটা দঙ্গল।

৬৭. বড় তরমুজটির আয়তন ছোটটির থেকে

$$\frac{৫}{৪} \times \frac{৫}{৪} \times \frac{৫}{৪} = \frac{১২৫}{৬৪}$$

গুণ বেশি, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং বড় তরমুজ কেনাই ভালো। এর দাম ছোটটির থেকে মাত্র দেড় গুণ বেশি, কিন্তু খোলটি দ্বিগুণেরও বেশি।

এখন তোমরা প্রশ্ন করতে পারো ফলওয়ালারা কেন তাহলে দ্বিগুণ দাম না চয়ে মাত্র দেড় গুণ দাম চায়? কারণ খুবই সহজ। বেশিরভাগ ফলওয়ালাই জ্যামিতিতে কাঁচা। কিন্তু এ ব্যাপারে ক্রেতারাও একইরকম। সেজন্যেই তারা অনেক সময় এই লাভজনক প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে বসে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ছোট তরমুজ কেনার চাইতে বড় তরমুজ কেনাই

Scanned by CamScanner

ভালো, সেগুলোর দাম আসলে যা হওয়া উচিত তার থেকে সবসময়ই কম থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্রেতা তা আন্দাজ করতেও পারে না।

একই কারণে ছোট ডিম কেনার চাইতে বড় ডিম কেনা অনেক লাভের, অবশ্য যদি তা ওজনদরে বিক্রি না হয়।

৬৮. একাধিক পরিধির ভেতরে যে অনুপাত থাকে তাদের ব্যাসও সেই একই অনুপাত অনুযায়ী হয়। যদি একটি ফুটির পরিধি হয় ৬০ সেন্টিমিটার ও অন্যটির হয় ৫০ সেন্টিমিটার, তাহলে তাদের ভেতর অনুপাত হবে ৬০ : ৫০ = ৬/৫ এবং তাদের আকৃতির অনুপাত হবে :

$$\left(\frac{৬}{৫}\right)^৩ = \frac{২১৬}{১২৫} = ১.৭৩$$

$$(৬/৫)^{\circ} = ২১৬ = ১.৭৩$$

বড় ফুটিটির দাম যদি আকৃতি (বা ওজন) অনুযায়ী ধরা হয় তাহলে তার দাম হওয়া উচিত ছোটটির চাইতে ১.৭৩ গুণ বা ৭৩ শতাংশ বেশি। কিন্তু বিক্রেতারা শতকরা ৫০ ভাগ বেশি দাম চেয়ে থাকে। তাহলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে বড় ফুটি কেনা অনেক লাভের।

৬৯. ধাঁধাটিতে দেয়া আছে যে চেরি ফলের ব্যাস তার বীচির ব্যাসের তিন গুণ। সুতরাং চেরি ফলের আয়তন বীচির চাইতে ৩ × ৩ × ৩ = ২৭ গুণ বেশি। তার অর্থ বীচিটা তেরী ফলের ১/২৭ ভাগ জুড়ে থাকে আর শাঁসটা থাকে বাকি ২৬/২৭ অংশে। তার মানে শাঁসটা বীচির চাইতে আয়তনে ২৬ গুণ বড়।

৭০. যদি আসল আইফেল টাওয়ার থেকে তার মডেলটা ৮ লক্ষ ভাগ ওজনের হয় এবং তারা একই ধাতু দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে মডেলের আয়তন আসল টাওয়ারের আয়তন থেকে ৮ লক্ষ ভাগ কম হওয়া উচিত। আমরা জানি একইরকম চেহারার জিনিসের অনুপাত আর তাদের উচ্চতার ঘনফলের অনুপাত অভিন্ন। সুতরাং মডেলটির মাপ আসল টাওয়ারের চাইতে ২০০ ভাগ কম হবে, কারণ

$$২০০ \times ২০০ \times ২০০ = ৮০,০০,০০০$$

আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা ৩০০ মিটার। সুতরাং মডেলের উচ্চতা হবে

$$৩০০ : ২০০ = ১\frac{১}{২} \text{ মিটার।}$$

তাহলে মডেলটির উচ্চতা প্রায় একজন মানুষের সমান হবে।

Scanned by CamScanner

৭১. দুটো কড়াই জ্যামিতিকভাবে সদৃশ। যদি বড় কড়াইয়ে আট গুণ বেশি। জায়গা হয় তাহলে এর সমস্ত রৈখিক মাপ দ্বিগুণ বেশি হবে। এটা উচ্চতায় ও প্রস্থেও হবে দ্বিগুণ। তাই যদি হয় তাহলে এর পৃষ্ঠতল হবে ২ × ২ = ৪ গুণ বড়। কারণ অনুরূপ জিনিসের পৃষ্ঠতলের অনুপাত এবং তাদের রৈখিক মাপের বর্গফলের অনুপাত অভিন্ন। এদের দেয়াল সমান পুরু। কড়াইয়ের ওজন নির্ভর করছে পৃষ্ঠতলের মাপের ওপর। সুতরাং উত্তর হবে : বড় কড়াইটা চার গুণ ভারী।

৭২. প্রথম নজরে ধাঁধাটায় যে অঙ্কের কিছু আছে তা মনেই হবে না। কিন্তু আসলে আগেরটার মতো এটারও সমাধান হবে জ্যামিতির সাহায্যে।

এই ধাঁধাটা সমাধান করতে বসার আগে আর একটা ঐ ধরনেরই, কিন্তু সোজা ধাঁধা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

একটা ছোট আর একটা বড়—দুটো বয়লার। দুটো আকারে একইরকম এবং একই উপাদানে তৈরি। তাদের ভর্তি করা হলো গরম জল দিয়ে। এদের ভেতর কোনটায় জল তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে?

জিনিস সাধারণত ঠাণ্ডা হয় উপরিভাগ থেকে। সুতরাং যে বয়লার প্রতি একক ঘনত্বে বড় পৃষ্ঠতল থাকবে তা ঠাণ্ডা হবে তাড়াতাড়ি। যদি একটি বয়লার অন্যটির থেকে ন গুণ উঁচু, ন গুণ চওড়া হয় তাহলে এর পৃষ্ঠতল হবে $ন^২$ গুণ ও আয়তন $ন^৩$ গুণ বড়। বড় বয়লারটিতে প্রতিটি একক পৃষ্ঠতলের ভাগে আছে গুণ বেশি আয়তন। সুতরাং ছোট বয়লার ঠাণ্ডা হবে তাড়াতাড়ি।

একই কারণে শীতের দিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি শিশু ঠিক তারই মতো পোশাক-পরা কোনো বয়স্ক লোকের চাইতে ঠাণ্ডা অনুভব করবে অনেক বেশি। দু'জনের ক্ষেত্রে তাদের শরীরের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে উত্তাপের পরিমাণ প্রায় সমান। কিন্তু শিশুটির শরীরের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে বয়স্ক লোকটির চাইতে ঠাণ্ডা হবার মতো বহির্ভাগ রয়েছে বেশি।

এই কারণেই শরীরের অন্য অংশের চাইতে মানুষের আঙুলে এবং নাকে বেশি ঠাণ্ডা লাগে ও এই জায়গাগুলো তুষারাহত হয়ে থাকে। কেননা শরীরের আয়তনের তুলনায় শরীরের অন্য অংশের বহির্ভাগ কোথাও এত বড় নয়।

সবশেষে আর একটা উদাহরণও একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : গাছের গুঁড়িতে আগুন ধরতে যে সময় লাগে, সেই গুঁড়ি থেকেই চেরা কাঠে আগুন ধরতে তার অনেক কম সময় লাগে।

Scanned by CamScanner

উত্তাপ কোনো জিনিসের গায়ের উপরিভাগ থেকে সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কাঠের উপরিভাগ ও আয়তনের (ধরা যাক বর্গক্ষেত্রের মতো টুকরো) সঙ্গে সমান দৈর্ঘ্যের ও বর্গক্ষেত্রের মতো টুকরো চেহারার গাছের গুঁড়ির পৃষ্ঠতল ও আয়তনের তুলনা করে দু' ক্ষেত্রে প্রতি একক ঘন সেন্টিমিটার কাঠে কতটা পৃষ্ঠতল আছে তা বের করতে হবে। যদি গাছের গুঁড়ি চেরা কাঠ থেকে দশ গুণ মোটা হয় তাহলে গুঁড়ির বাইরের দিকের গা চেরা কাঠের গা থেকে দশ গুণ বেশি বড় হবে। আর আয়তন হবে ১০০ গুণ। প্রতি একক পৃষ্ঠতলে যতটা পরিমাণ কাঠ গাছের গুঁড়িতে আছে, চেরাই কাঠে আছে তার দশ ভাগের এক ভাগ। তাহলে একই পরিমাণের তাপ চেরাই কাঠে গরম করে তুলছে দশ ভাগের এক ভাগ উপাদানকে। সুতরাং একই উৎস থেকে উত্তাপ কাঠের গুঁড়ির চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি আগুন ধরায় চেরা কাঠে। (কাঠের তাপ পরিবহন করার ক্ষমতা খুব কম। সুতরাং এই তুলনাকে মোটামুটি ঠিক ধরতে হবে। এটাই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্য এবং উপাদানের পরিমাণের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।)

Scanned by CamScanner

৭৩. বৃষ্টি মাপার যন্ত্র : প্লুভিওমিটার

সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনগ্রাদকে অতিবৃষ্টির শহর বলে মনে করা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, মস্কোর থেকেও এখানে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা তা অস্বীকার করেন। তাঁরা দাবি করেন যে বৃষ্টি লেনিনগ্রাদের থেকে অনেক বেশি জল দেয় মস্কোতে। তাঁরা কিভাবে জানলেন এটা? সত্যিই কি বৃষ্টির জল মাপার কোনও যন্ত্র আছে?

কাজটা কঠিন বলেই মনে হবে। কিন্তু এটা কী করে করতে হয় তা তোমরা নিজেরাই শিখতে পারো। যত জল মাটির উপর নেমে আসে তার সবটাকেই জমাতে হবে এমন ভেব না কিন্তু। যদি বৃষ্টির জল ছড়িয়ে না পড়ত বা ম্যাটি জল শুষে না নিত, তাহলে শুধু জলের গভীরতা মেপে নিলেই হতো। সে কাজটা কিছু কঠিনও হতো না। যখন বৃষ্টি হয় তখন তা সব জায়গাতেই সমানভাবে পড়ে। বাগানের একটা ফুলের বেডে বেশি জল পড়ল বা পাশেরটায় কম পড়ল এমন কোনো ঘটনা ঘটে না। সুতরাং কোনো জায়গায় জলের গভীরতা মেপে নিলেই সমস্ত জায়গাটায় জলের গভীরতা জানার পক্ষে যথেষ্ট হতো।

এতক্ষণে বোধহয় তোমরা আন্দাজ করেছ, বৃষ্টির জল মাপতে হলে তোমাদের কী করতে হবে। তোমাদের যা করতে হবে তা হলো : একটা ছোট পাত্র নিতে হবে যার থেকে জল ছড়িয়ে পড়বে না বা মাটিতে শুষে যাবে না। যে কোনো মুখখোলা পাত্র, যেমন ধরো একটা বালতিতেই কাজ চলে যাবে। যদি তোমাদের কাছে কোনো খাড়া দেয়াওয়ালা পাত্র থাকে (যার চেহারা হবে খাড়া দেয়াওয়ালা গোল সিলিন্ডারের মতো) তবে বৃষ্টির সময় সেটা বাইরে রেখে দিও।* বৃষ্টি থামলে পাত্রের ভেতর জলের গভীরতা মেপে নাও। তাহলেই তোমার দরকার যা তা পেয়ে গেলে।

দেখা যাক, আমাদের ঘরে তৈরি বৃষ্টিমাপক যন্ত্র—প্লুভিওমিটার কেমন কাজ করে। বালতির ভেতরে জলের গভীরতা মাপা হবে কী করে? একটা রুলা দিয়ে? এ উপায়টা মন্দ নয়, যদি ভেতরে জল যথেষ্ট থাকে। কিন্তু সাধারণত মাত্র ২ কি ৩ সেন্টিমিটার জল জমে বালতিতে, আবার কখনও জমে মাত্র অল্প কয়েক মিলিমিটার। সেসব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে মাপা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের কাজে প্রতিটি মিলিমিটার, এমনকি তার প্রতিটি ভগ্নাংশও খুব মূল্যবান। তাহলে কী করা যায়?

---

* পত্রটাকে যথাসম্ভব উঁচুতে রাখতে হবে যাতে যে ফোঁটাগুলো মাটিতে পড়বে তা ছিটকে উঠে পাত্রের ভেতর না ঢোকে।

Scanned by CamScanner

সবচেয়ে ভালো হবে জলটাকে বালতি থেকে খুব সরু কোনো কাচের পাত্রে ভরে নেয়া। তাহলে জলটা বেশ উঁচু হয়ে থাকবে। আর স্বচ্ছ দেয়ালের ভেতর দিয়ে জল কতটা উঁচু হয়ে জমেছে তা দেখাও সহজ হবে। অবশ্য সরু পাত্রে জমা জলের গভীরতা বালতির জলের মাপ হবে না। কিন্তু এভাবে একটা মাপকে আর একটা মাপে পরিবর্তন করে নেয়া যায়। যদি সরু পাত্রের ব্যাস আমাদের প্লুভিওমিটার, অর্থাৎ বালতির দশ ভাগের এক ভাগ হয়, তাহলে এর ভিতের আয়তন বালতির ভিতের আয়তনের ১০ × ১০ = ১০০ ভাগ ছোট হবে। অর্থাৎ সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, কাচের পাত্রে জলের লেভেলটা থাকবে বালতিতে যেখানে ছিল তা ১০০ গুণ উপরে। যদি বালতিতে বৃষ্টির জল থাকে ১ মিলিমিটার উচ্চতায়, তাহলে কাচের পাত্রে থাকবে ২০০ মিলিমিটার বা ২০ সেন্টিমিটার উচ্চতায়।

এই হিসেব থেকে দেখা যাবে যে বালতি (প্লুভিওমিটার) থেকে পাত্রটা খুব বেশি সরু হওয়া উচিত নয়। কেননা তাহলে বৃষ্টি জলের গভীরতা মাপার জন্যে আমাদের খুব বেশি লম্বা পাত্র দরকার হবে। এটা পাঁচ ভাগের এক ভাগ সরু হলেই যথেষ্ট। তাহলে এর ভিতের আয়তন বালতির ভিতের আয়তন থেকে ২৫ ভাগ ছোট হবে। আর জলের লেভেল উঠবে ২৫ গুণ উপরে। বালতির প্রতি মিলিমিটার জল কাচের পাত্রের ২৫ মিলিমিটার জলের সমান হবে। কাজের সুবিধার জন্যে কাচের গ্লাসের বাইরের দিকে একটুকরো কাগজ সেঁটে দাও। একে প্রতিটি এক মিলিমিটার করে ২৫টা ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগে ১, ২, ৩ ইত্যাদি লিখে দাও। কাচের পাত্রে জলের উচ্চতা দেখে সোজাসুজিই প্লুভিওমিটারের বালতিতে কতটা জল জমেছে তা জানতে পারবে, কোনো পরিবর্তনের হিসেবে করতে হবে না। যদি কাচের পাত্রের ব্যাস বালতির ব্যাসের থেকে পাঁচ ভাগ কম না হয়ে চার ভাগ হয় তাহলে কাগজের টুকরোর উপরের ভাগগুলো ১৬ মিলিমিটার ফাঁক হবে।

একটা বালতি থেকে সরু কাচের পাত্রে জল ঢালা খুবই অসুবিধের ব্যাপার। এর একটা সুবিধেজনক সমাধান হবে বালতির দেয়ালের গায়ে ফুটো করে নিয়ে একটা কাচের টিউব দিয়ে জলটা বের করে নেওয়া।

তাহলে এবার বৃষ্টির জলের গভীরতা মাপার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হলো। একটা বালতি আর বাড়িতে তৈরি বৃষ্টি মাপার পাত্র কিন্তু আবহাওয়া অফিসের আসল প্লুভিওমিটার বা দাগ-কাটা কাচের গ্লাসের মতো হবে না। তবু এই সাধারণ এবং সস্তা যন্ত্র দিয়ে তুমি অনেক শিক্ষাপ্রদ হিসেব করে ফেলতে পারবে। এখানে আর কয়েকটা সমস্যা দেয়া হলো।

Scanned by CamScanner

৭৪. কতটা বৃষ্টি হলো?

তোমাদের সব্জি বাগানটি ৪০ মিটার লম্বা ও ২৪ মিটার চওড়া। সবে বৃষ্টি থেমেছে। এই বাগানে কতটা বৃষ্টি হয়েছে তুমি জানতে চাও। এখন মাপটা কী করে হবে?

বৃষ্টির জলের গভীরতা বের করা থেকে শুরু করতে হবে। এটা না জানলে কিছু করা যাবে না। ধরা যাক, তোমার বাড়িতে তৈরি বৃষ্টিমাপক যন্ত্র প্লুভিওমিটারে ৪ মিলিমিটার জল জমেছে। যদি মাটি শুষে না নিয়ে থাকে তাহলে সব্জি বাগানে প্রতি বর্গমিটারে কত ঘন সেন্টিমিটার করে জল পড়েছে, তা হিসেব করা যাক। এক বর্গমিটারের অর্থ ১০০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১০০ সেন্টিমিটার চওড়া ক্ষেত্র। এটা ঢাকা পড়েছে ৪ মিলিমিটার অর্থাৎ ০.৪ সেন্টিমিটার জলে। তাহলে এই জলের স্তরের আয়তন হবে : ১০০ × ১০০ × ০.৪ = ৪০০০ ঘন সেন্টিমিটার। তোমরা জানো যে ১ ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন হলো ১ গ্রাম। সুতরাং, সব্জি বাগানের প্রতি বর্গমিটারে ৪০০০ গ্রাম বা ৪ কিলোগ্রাম করে জল হয়েছে। তোমাদের বাগানের ক্ষেত্রফল হলো : ৪০ × ২৪ = ৯৬০ বর্গমিটার। অর্থাৎ তোমাদের সব্জি বাগানে যতটা বৃষ্টি হয়েছে তার ওজন হলো ৪ × ৯৬০ = ৩৮৪০ কিলোগ্রাম অথবা ৪ টন থেকে কিছু কম।

একটা মজা করা যাক। হিসেব করো তো বৃষ্টিতে তোমার বাগানে যতটা জল হয়েছে বালতি করে তা আনতে গেলে কতগুলো বালতি লাগবে? একটা সাধারণ বালতিতে প্রায় ১২ কিলোগ্রাম জল ধরে। তাহলে, বৃষ্টিতে মোট ৩৮৪০ : ১২ = ৩২০ বালতি জল হয়েছে তোমার বাগানে।

তাহলে মিনিট পনেরোর মধ্যে তোমার বাগানে যে বৃষ্টি হয়েছে সেই পরিমাণ জলের জন্যে তোমাকে ৩০০-রও বেশি বালতি জল এনে ঢালতে হতো।

এক পশলা বৃষ্টি বা ঝিরঝিরে বৃষ্টিকে কি অঙ্ক দিয়ে হিসেব করা যায়? তার জন্যে আবার প্রতি মিনিটে কত মিলিমিটার করে বৃষ্টি হচ্ছে তা বের করতে হবে। যদি এমন বৃষ্টি হয় যে প্রতি মিনিটে ২ মিলিমিটার করে জল পড়ে তাহলে এটা হবে অস্বাভাবিক বর্ষণ। শরৎকালের ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ১ মিলিমিটার জল জমতে প্রায় এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময় লাগে।

তাহলে দেখছ বৃষ্টির জলের গভীরতা মাপা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, উপায়টা খুব সহজও। যদি চাও তাহলে বৃষ্টির ফোঁটার সংখ্যাও গুনতে পারো, অবশ্য মোটামুটিভাবে।* আসলে সাধারণ বৃষ্টিতে প্রতি গ্রামে গড়ে প্রায় ১২টা করে ফোঁটা হয়। তাহলে উপরের যে বৃষ্টির কথা বলছিলাম তাতে ছিল বর্গমিটার প্রতি ৪০০০ × ১২ = ৪৮,০০০ ফোঁটা। সারা সব্জি বাগানে মোট কত ফোঁটা জল পড়েছিল তা বের করা কঠিন নয়। কিন্তু হিসেবটা খুব উৎসাহজনক হলেও তা কোনো কাজে আসবে না। একটিমাত্র কারণে কথাটি উল্লেখ করলাম আমরা, খুব অবিশ্বাস্য রকমের হিসেব এটা, শুধু কি করে হিসেব করতে হবে তা যদি জানা থাকে।

---

* বৃষ্টি সবসময়েই ফোঁটা ফোঁটা পড়ে, যখন আমরা ভাবি হুড় হুড় করে জল পড়ছে তখনও।

Scanned by CamScanner

৭৫. কতটা তুষার?

বৃষ্টির জলের গভীরতা কী করে মাপতে হয় তা আমরা শিখেছি। শিলাবৃষ্টি হলে জলের গভীরতা মাপব কী করে? ব্যাপারটা একই। শিলাবৃষ্টির শিলের টুকরোগুলো বৃষ্টি মাপার যন্ত্রের ভেতরে পড়ে গলে যাবে। তারপর গভীরতা মেপে নাও।

কিন্তু তুষারবৃষ্টির সময় এর তফাৎ হবে। এক্ষেত্রে প্লুভিওমিটারে সঠিক হিসেব পাওয়া যাবে না। কারণ বাতাসের জন্যে কিছুটা তুষার বালতির বাইরে পড়বে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে তুষারজলের গভীরতা প্লুভিওমিটার ছাড়াই মাপা সম্ভব। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে তুষারজলের গভীরতা প্লুভিওমিটার ছাড়াই মাপা সম্ভব। কোনো উঠান বা মাঠের ভেতর তুষারের গভীরতা একটা কাঠের লাঠির সাহায্যেই মাপা যেতে পারে। বরফ গলে যাবার পর জলের গভীরতা কতটা হবে তা বের করার জন্যে একটা পরীক্ষা করতে হবে। সমান ভঙ্গুর বরফ দিয়ে একটা বালতি বোঝাই করো। বরফটা গলতে দাও, তারপর গভীরতা মেপে নাও। তাহলেই এক সেন্টিমিটার বরফে কতটা জল পাবে তা বের করে ফেলবে। এটা জানা হলে বরফের গভীরতাকে জলের গভীরতায় পরিণত করতে কোনো অসুবিধে নেই।

গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন বৃষ্টির জল মেপে নিয়ে তার সঙ্গে শীতকালে প্রতিদিন বরফ থেকে কতটা করে জল পাবে তা যোগ করতে ভুলো না। এতে বছরে তোমাদের জেলায় কতটা জল জমে তা জানতে পারবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, কারণ এ থেকে ঐ স্থানের বারিপাত জানা যায়। 'বারিপাত' বলতে আমরা বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি বা তুষারবৃষ্টি সব রকমের জল জমার কথা বুঝি।

নিচে সোভিয়েত ইউনিয়নের কতকগুলো শহরে গড়পড়াতা বার্ষিক বারিপাতের হিসেব দেয়া হলো :

লেনিনগ্রাদ .....৪৭ সে.মি.	আস্ত্রাখান ..... ১৪ সে.মি.
ভোলোগ্‌দা .....৪৫ সে.মি.	কুতাইসি .....১৭৯ সে.মি.
আর্খাঙ্গেলস্ক .....৪১ সে.মি.	বাকু .....২৪ সে.মি.
মস্কো .....৫৫ সে.মি.	স্‌ভের্দ্‌লোভ্‌স্ক .....৩৬ সে.মি.
কস্ত্রমা .....৪৯ সে.মি.	তবোল্‌স্ক .....৪৩ সে.মি.
কাজান.....৪৪ সে.মি.	সেমিপালাতিন্‌স্ক .....২১ সে.মি.
কুইবিশেভ.....৩৯ সে.মি.	আলমা-আতা .....৫১ সে.মি.
চ্‌কালভ .....৪৩ সে.মি.	তাশখন্দ .....৩১ সে.মি.
ওদেসা .....৪০ সে.মি.	ইয়েনিসেইস্ক.....৩৯ সে.মি.
	ইর্কত্‌স্ক .....৪৪ সে.মি.

Scanned by CamScanner

এদের ভেতর সবচেয়ে বেশি বারিপাত হয় কুতাইসিতে (১৭৯ সেন্টিমিটার) আর আস্ত্রাখানে হয় সবচেয়ে কম (১৪ সেন্টিমিটার), কুতাইসির চেয়ে ১৩ ভাগ কম। কিন্তু কুতাইসির চাইতেও অনেক বেশি বারিপাত হয় এমন একাধিক জায়গা পৃথিবীতে আছে। উদাহরণ দিচ্ছি : ভারতবর্ষে এমন একটি জেলা যা প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে যায়; এখানে বছরে বৃষ্টি হয় ১২৬০ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ ১২.৫ মিটারের বেশি! একবার তো দিনে ১০০ সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছিল। আবার আস্ত্রাখানের চেয়েও অনেক কম বৃষ্টি হয় এমন জায়গাও আছে, যেমন চিলিতে একটি অঞ্চলে বছরে বৃষ্টিপাতের অঙ্ক ১ সেন্টিমিটারেরও কম।

যেসব এলাকায় বছরে ২৫ সেন্টিমিটারের কম বৃষ্টি হয় সেগুলো অনাবৃষ্টির অঞ্চল। সেখানে কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা ছাড়া চাষবাস অসম্ভব।

এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ, পৃথিবীর নানা জায়গায় বাৎসরিক বারিপাতের পরিমাণ মেপে ফেলতে পারলে সারা পৃথিবীতে বাৎসরিক বৃষ্টির গড়পড়তা হিসেব করা সম্ভব। স্থলভাগে গপড়তা বাৎসরিক বৃষ্টি হয় ৭৮ সেন্টিমিটার। শোনা যায়, স্থলভাগে যতটা বৃষ্টি হয়, জলভাগের ঠিক ততটা পরিমাণ অঞ্চলে প্রায় একই পরিমাণ বৃষ্টি হয়। এটা জানা থাকলে সারা পৃথিবীতে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি বা তুষারপাত ইত্যাদিতে কতটা জল জমে তা হিসেব করা কঠিন নয়। সেজন্যে সারা পৃথিবীর উপরিভাগের আয়তন কত তা জানা দরকার। যদি তা না জানা থাকে তাহলে এভাবে হিসেব করে নাও।

এক মিটার হলো পৃথিবীর পরিধির ঠিক ৪ কোটি ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধি ৪ কোটি মিটার বা ৪০,০০০ কিলোমিটার। পৃথিবীর ব্যাস হলো পরিধির প্রায় ৩১/৭ ভাগ ছোট। তাহলে পৃথিবীর ব্যাস সহজেই হিসেব করা যেতে পারে :

৪০,০০০ : ৩ ১/৭ = ১২,৭০০ কিলোমিটার।

কোনো গোল বস্তুর বাইরের দিকের আয়তন বের করার নিয়ম হলো ব্যাসকে তারই সঙ্গে গুণ করে আবার ৩১/৭ দিয়ে গুণ করা :

১২,৭০০ × ১২,৭০০ × ৩১ / ৭ = ৫০, ৯০,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার।

(উত্তরে চতুর্থ রাশি থেকে শুধু শূন্য লেখা হলো, কেননা মাত্র প্রথম তিনটে রাশিই নির্ভরযোগ্য।)

তাহলে, ভূপৃষ্ঠের আয়তন ৫০৯০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার।

এখন আমাদের প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। প্রথমে হিসেব করছি পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতটা করে বৃষ্টি হয়। ১ বর্গমিটার বা ১০,০০০ বর্গসেন্টিমিটারে হয় :

৭৮ × ১০,০০০ = ৭,৮০,০০০ ঘন সেন্টিমিটার।

প্রতি বর্গকিলোমিটারে আছে ১০০০ × ১০০০ = ১০,০০০০০ বর্গ মিটার।

Scanned by CamScanner

তাহলে প্রতি বর্গকিলোমিটার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ :

৭,৮০,০০,০০,০০,০০০ ঘন সেন্টিমিটার, অথবা ৭,৮০,০০০ ঘন মিটার এবং সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ :

৭,৮০,০০০ × ৫০,৯০,০০,০০০ = ৩৯৭০,০০,০০,০০,০০,০০০ ঘন মিটার

একে ঘন কিলোমিটারে পরিবর্তন করতে হলে ১০০০ × ১০০০ × ১০০০, অর্থাৎ ১০০০০ লক্ষ দিয়ে ভাগ করতে হবে। উত্তর হবে ৩,৯৭,০০০ ঘন কিলোমিটার।

তাহলে আবহমণ্ডল থেকে আমাদের পৃথিবীতে বৎসরে গড়পড়তা বৃষ্টি হয় ৪ লক্ষ ঘন কিলোমিটার (মোটামুটি)

বৃষ্টি ও তুষারের জ্যামিতি সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনার এখানেই ইতি। আবহবিদ্যার বইতে আরও বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

৭৬. মহাপ্লাবন

বাইবেলে আছে, পৃথিবীতে একসময় বৃষ্টির জলে এমন প্লাবন হয়েছিল যা সবচেয়ে উঁচু পর্বতকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। এই কাহিনীতে আছে "পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করে ঈশ্বরের পরে খুব অনুতাপ হয়েছিল।"

ঈশ্বর বললেন, "যে মানুষকে সৃষ্টি করেছি তাকে বিনষ্ট করে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলে দেব আমি, মানুষ, পশু, লতাপাতা বা আকাশের পাখি, সবকিছু!"

একমাত্র ন্যায়পরায়ণ নোয়া-কেই বাঁচাতে চেয়েছিলেন ঈশ্বর। তিনি তাঁকে পৃথিবীর আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে একটা জলযান বানাতে বললেন, যা হবে ৩০০ হাত লম্বা, ৫০ হাত চওড়া এবং ৩০ হাত উঁচু। জাহাজটা ছিল তেতলা। শুধু নোয়া এবং তাঁর পরিবারবর্গ বা তাঁর উপযুক্ত সন্তানদের আত্মীয়-পরিজনই নয়, পৃথিবীর সমস্ত জীবিত প্রাণীর বংশরক্ষা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। দীর্ঘ সময়ের পক্ষে পর্যাপ্ত খাবার ও একজোড়া করে প্রতিটি জীবিত প্রাণী এই জাহাজে নেবার জন্যে নোয়াকে নির্দেশ দিলেন ঈশ্বর।

পৃথিবীর সমস্ত জীবিত প্রাণীকে ধ্বংস করার উপায় হিসেবে ঈশ্বর বেছে নিলেন এই মহাপ্লাবনকে। সমস্ত মানুষ আর পশুকে বিনাশ করার হাতিয়ার হলো জল। তারপর নোয়া এবং সে সমস্ত প্রাণীকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হলো তারাই সৃষ্টি করবে নতুন মানববংস ও জীবজগৎ।

বাইবেলের বর্ণনা : "সাতদিন গত হলে প্লাবনের জল এলো মাটির বুকে ..... চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত বৃষ্টি ঝরে পড়ল পৃথিবীতে ..... জল বেড়ে উঠে ভাসিয়ে তুলল সেই জাহাজকে ..... অন্তহীন জলরাশি জমল পৃথিবীর উপর। আকাশের নিচে উঁচু হয়ে ছিল যত পাহাড়-পর্বত সব ডুবে গেল জলের নিচে। পনেরো হাত উঁচু হয়ে জমে রইল জল ..... পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী হলো বিনষ্ট। শুধুমাত্র বেঁচে রইলেন নোয়া আর জাহাজে যারা ছিল তাঁর সঙ্গে।" বাইবেলের বর্ণনামতো আরও ১১০ দিন সেই জল জমে রইল পৃথিবীর উপর, তারপর কমে গেল। তখন যে সমস্ত জীবজন্তুকে তিনি রক্ষা করেছিলেন তাদের সঙ্গে জাহাজ থেকে বের হয়ে এসে নোয়া নতুন বসবাসের জন্যে পৃথিবীতে নামলেন।

মহাপ্লাবনের কাহিনী থেকে দুটো প্রশ্ন ওঠে :

(১) উচ্চতম পর্বতগুলোকেও ডুবিয়ে দেয়ার মতো বৃষ্টি কি সম্ভব?

(২) নোয়ার জাহাজে কি সত্যিই পৃথিবীর বংশধরদের জায়গা হওয়া সম্ভব ছিল?

Scanned by CamScanner

৭৭. মহাপ্লাবন হওয়া কি সম্ভব?

দুটো প্রশ্নেরই সমাধান অঙ্কের সাহায্যে করা যেতে পারে। মহাপ্লাবনের এই জল এলো কোথা থেকে? আকাশ থেকে নিশ্চয়ই। তারপর সে জল গেল কোথায়? সারা পৃথিবীর জল মাটিতে শুষে নেয়া সম্ভব নয়, অন্য কোনো উপায়ে উবে যাওয়াও সম্ভব নয়। একমাত্র যে জায়গায় এই জল যেতে পারে তা হলো বায়ুমণ্ডলে; অর্থাৎ এই জল বাষ্প হয়ে যেতে পারে। তাহলে বায়ুমণ্ডলেই এখন জলটা আছে। এখন যদি আকাশের সমস্ত বাষ্প জমে জলবিন্দুতে পরিণত হয় ও পৃথিবীতে ঝরে পড়ে তাহলে আবার আর একটি মহাপ্লাবন হয়ে সর্বোচ্চ পর্বতগুলোকেও ডুবিয়ে দেবে। দেখাই যাক ব্যাপারটা সম্ভব কি-না।

বায়ুমণ্ডলে কতটা আর্দ্রতা আছে আবহবিদ্যার বইতে তা পাওয়া যাবে। তাতে আছে, প্রতি বর্গমিটার জায়গায় উপরিভাগে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তাতে গড়পড়তা ১৬ কিলোগ্রাম বাষ্প থাকে এবং ২৫ কিলোমিটার বেশি কখনোই থাকতে পারে না। যদি এই সমস্ত বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে তাহলে সেই জলের গভীরতা কত হতে পারে মাপা যাক। পঁচিশ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ ২৫,০০০ গ্রাম জলের আয়তন হবে ২৫,০০০ ঘন সেন্টিমিটারের সমান। এই আয়তন হবে প্রতি ১ বর্গমিটার, অর্থাৎ ১০০ × ১০০ = ১০,০০০ বর্গসেন্টিমিটার জায়গার উপরের স্তরে। জলের আয়তনকে ভূমির ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলে জলস্তরের গভীরতা পাওয়া যাবে :

২৫,০০০ : ১০,০০০ = ২.৫ সেন্টিমিটার

প্লাবনের জল ২.৫ সেন্টিমিটারের বেশি উঠতে পারে না, কারণ বায়ুমণ্ডলে তার চেয়ে বেশি জল থাকাই সম্ভব নয়।* আবার এটুকু উচ্চতায় জমা সম্ভব হতে পারে একমাত্র যদি মাটি এই বৃষ্টির জল শুষে না নেয়।

আমাদের হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে মহাপ্লাবন যদি হয়ে থাকে তাহলেও জল ২.৫ সেন্টিমিটারের বেশি উঠতে পারেনি। এভারেস্ট পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ হচ্ছে ৯ কিলোমিটার উঁচু, অর্থাৎ এই জল থেকে অনেক অনেক উঁচু। বাইবেলে জলের গভীরতাকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে, মাত্র ৩,৬০,০০০ গুণ বাড়ানো হয়েছে!

আবার যদি দৃষ্টি হয়ে 'প্লাবন' হয়েও থাকে, তাহলে ঠিক যাকে বৃষ্টি বলে তা হয়নি, একটি ঝিরঝিরে বর্ষণ হয়েছে মাত্র। কেননা ৪০ দিন ধরে বিরামহীন বৃষ্টির ফলে যদি মাত্র ২৫ মিলিমিটার জল জমে, তাহলে দৈনিক বৃষ্টি হতে হবে ০.৫ মিলিমিটারেরও কম। শরৎকালে যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে থাকে তাতেও এর ২০ গুণ জল হয়।

---

* বহু জায়গায় বৃষ্টিপাত অনেক সময় ২.৫ সেন্টিমিটারকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে জল বায়ুমণ্ডল থেকে সোজাসুজি শুধু সে জায়গায় পড়ে না, পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বাতাস জল বয়ে আনে। বাইবেলের মতে মহাপ্লাবন একই সঙ্গে সারা পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল জলের নিচে, সুতরাং এক অঞ্চল অন্য অঞ্চল থেকে জল আসা সম্ভব ছিল না।

Scanned by CamScanner

৭৮. ঐরকম একটা জাহাজ ছিল কি?

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা ধরা যাক : নোয়া যে সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করেছিলেন ঐ জাহাজে তাদের সকলের জায়গা হওয়া কি সম্ভব ছিল?

দেখা যাক, মোট জায়গা ছিল কতটা। বাইবেলে আছে জাহাজটা ছিল তিনতলা। প্রতিতলা ৩০০ হাত লম্বা আর ৫০ হাত চওড়া। প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ার লোকদের ভেতর 'এক হাত' বলতে যে মাপ বোঝানো হতো তাকে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করলে দাঁড়ায় প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার বা ০.৪৫ মিটার। তাহলে প্রতি তলা ছিল ৩০০ × ০.৪৫ = ১৩৫ মিটার লম্বা, আর

৫০ × ০.৪৫ = ২২.৫ মিটার চওড়া।

তাহলে প্রতিটি মেঝের মাপ ছিল ১৩৫ × ২২.৫ = ৩০৪০ বর্গমিটার। সুতরাং, তিনটে তলা মিলিয়ে প্রাণীদের জন্যে মোট জায়গা ছিল :

৩০৪০ × ৩ = ৯১২০ বর্গমিটার।

এখন ধরা যাক, কেবল স্তন্যপায়ীদের জন্যেই এ জায়গা যথেষ্ট কি-না? স্থলে স্তন্যপায়ী আছে প্রায় ৩৫০০ জাতের। আর নোয়াকে স্তন্যপায়ীদের জন্যেই কেবল জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়নি; যে ১৫০ দিন ধরে জল পুরোপুরি কমে যায়নি ততদিন চলার মতো যথেষ্ট খাবারের জায়গাও দিতে হয়েছিল। তারপর আবার একথা ভুললে চলবে না যে শিকারি প্রাণীদের জন্যেই শুধু জায়গা হলে হবে না। তাদের শিকারের জন্যেও জায়গা দরকার। আবার এই শিকারের খাদ্যের জন্যেও জায়গা দরকার। জাহাজের প্রতিজোড়া স্তন্যপায়ীর জন্যে জায়গা ছিল :

৯১২০ : ৩৫০০ = ২.৬ বর্গমিটার।

নিঃসন্দেহে এই জায়গা পর্যাপ্ত নয়। বিশেষত আরও একটা জিনিস ধরতে হবে। নোয়া ও তাঁর বিরাট পরিবারবর্গের জন্যেও কিছু থাকবার জায়গা দরকার হয়েছিল এবং প্রাণীদের খাঁচাগুলোকে কাঁক কাঁক করে রাখতে হয়েছিল।

স্তন্যপায়ী ছাড়া নোয়াকে আরও অনেক বেশি নিতে হয়েছিল। হয়তো তারা স্তন্যপায়ীদের মতো অত বড় নয়। কিন্তু তাদের ভেতর আছে অনেক বেশি জাতি ও প্রকারভেদ। তাদের সংখ্যা প্রায় এইরকম দাঁড়াবে :

পাখি	৩,০০০
সরীসৃপ	৩,৫০০
উভচর	১,৪০০
অঙ্গুরীমাল	১৬,০০০
পতঙ্গ	৩,৬০,০০০

Scanned by CamScanner

কেবল স্তন্যপায়ীদেরই যদি ঐ জাহাজে গাদাগাদি করে থাকতে হয়, তাহলে অন্যান্য প্রাণীর জন্যে ওখানে তিল ধারণের জায়গাও ছিল না। পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত প্রাণীর জন্যে জায়গা দিতে হলে জাহাজকে তার আসল মাপের চেয়ে অনেক গুণ বড় হতে হয়। তাহলে বাইবেলের কথামতো এটা ছিল একটা বিরাট জাহাজ। নাবিকদের ভাষায় বলতে গেলে জাহাজটার আকৃতি ছিল ২০,০০০ টন জল স্থানচ্যুত করার মতো। সেই পুরনো যুগে যখন জাহাজ নির্মাণ শিল্পের শৈশব অবস্থা তখনকার লোকদের পক্ষে এই বিরাট মাপের জাহাজ তৈরির কায়দাকানুন জানার কথা সম্পূর্ণ অবাস্তব। জাহাজটা বড় হতে পারে, কিন্তু যে বিরাট কাজের বর্ণনা বাইবেলে দেয়া আছে, তা পালন করার মতো বড় ছিল না। প্রশ্নটা আসলে পাঁচ মাসের উপযুক্ত খাবারদাবারসহ একটা পুরো চিড়িয়াখানা নিয়ে যাওয়ার মতোই।

মোদ্দাকথা, বাইবেলে প্লাবনের গল্পকে মিথ্যে করে দিচ্ছে অঙ্কের হিসেব। আসলে ও রকম কিছু ঘটাই অসম্ভব। যদি কিছু হয়েও থাকে তো মনে হয় কোনো স্থানীয় বন্যা হতে পারে। বাকি গল্পটা কল্পনা।

Scanned by CamScanner

পাঠকদের কাছে বইটা খুবই কাজের হয়েছে বলেই আশা করছি আমি। আরও আশা করছি যে, বইটা শুধু আনন্দই দেয়নি, বুদ্ধি আর উদ্ভাবনী শক্তি বাড়াতে, জ্ঞানকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করতেও সাহায্য করেছে। বইটা পড়ে নিশ্চয়ই বুদ্ধিটা একটু বাজিয়ে নিতে চাইবে তোমরা। তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে এই শেষ পরিচ্ছেদে নানা রকমের কিছু ধাঁধা দেয়া হয়েছে।

৭৯. শেকল

প্রতি ভাগে তিনটি করে আংটা লাগানো একটা শেকলের সমান পাঁচটা ভাঙা অংশ কামারকে দেয়া হলো জোড়া দেবার জন্যে।

কাজে হাত লাগাবার আগে কামার তো ভাবতে শুরু করল ক'টা আংটা খুলে ফেলে তবে জোড়া দেয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত সে চারটে খুলবে বলে ঠিক করল।

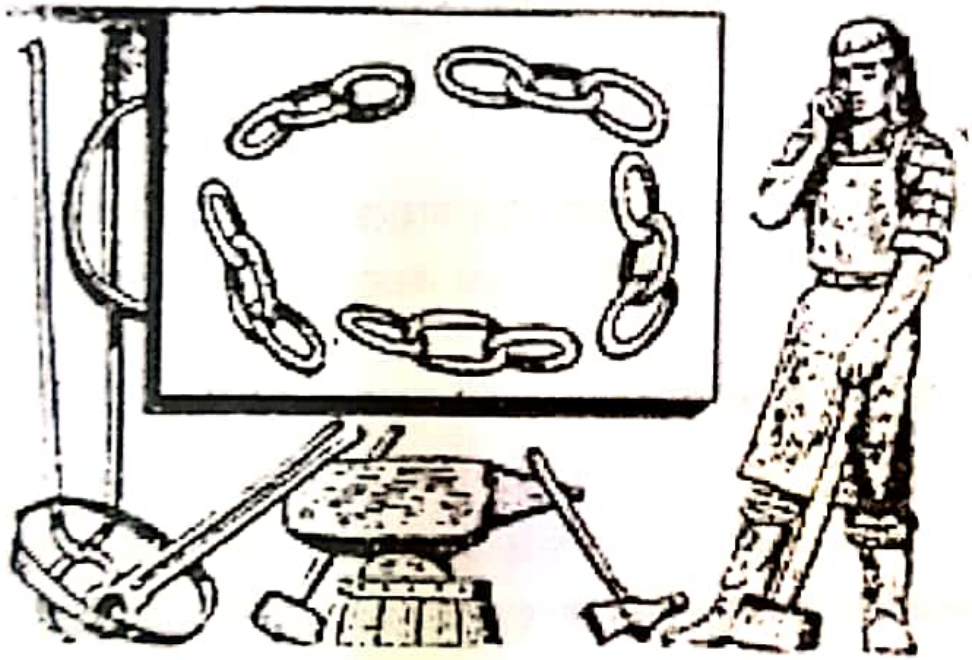

৪৭ নং ছবি

আরও কম আংটা খুলে ফেলে, তারপর জুড়ে দিয়ে কি কাজটা হতে পারে না?

৮০. মাকড়সা আর গুবরেপোকা

৮টা মাকড়সা আর গুবরেপোকা ধরে একটি ছেলে একটা ছোট বাক্সে রেখেছিল। তাদের পাগুলো গুনতি করে সে দেখল মোট ৫৪টা হচ্ছে। তাহলে ক'টা মাকড়সা আর ক'টা গুবরেপোকা সে জোগাড় করেছিল?

Scanned by CamScanner

৮১. বর্ষাতি, টুপি আর গ্যালোস

কোনো লোক একটা বর্ষাতি, একটা টুপি আর একাজোড়া গ্যালোস* কেনে। সব ক'টার দাম ছিল ২০ রুবল। বর্ষাতির দাম টুপির চেয়ে ৯ রুবল বেশি, আবার বর্ষাতি আর টুপির দাম একসঙ্গে মিলিয়ে গ্যালোসের চাইতে ১৬ রুবল বেশি। তাহলে প্রত্যেকটার দাম সে কত করে দিয়েছিল?

প্রশ্নটা কিন্তু মনে মনে সমাধান করতে হবে। সমীকরণে কষা চলবে না।

৮২. মুরগির আর পাতিহাঁসের ডিম

ঝুড়িগুলোতে মুরগি আর পাতিহাঁসের ডিম আছে। কয়েকটায় মুরগির ডিম আর কয়েকটায় আছে পাতিহাঁসের ডিম। কোন ঝুড়িতে ক'টা করে ডিম আছে তা ঝুড়ির গায়ে লেখা আছে—৫, ৬, ১২, ১৪, ২৩ আর ২৯। ব্যাপারি বলল, "যদি আমি এই ঝুড়িটা বিক্রি করি তাহলে পাতিহাঁসের ডিম যা পড়ে থাকবে, মুরগির ডিম থাকবে তার চেয়ে দ্বিগুণ।"

কোন ঝুড়িটার কথা সে মনে ভেবেছিল (৩২ নং ছবি)?

৮৩. আকাশভ্রমণ

ক থেকে খ-তে পৌছতে একটা উড়োজাহাজের লাগে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট, আর ফিরে আসতে লাগে মাত্র ৮০ মিনিট। এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

৮৪. উপহারের টাকা

দু'জন ছেলেকে তাদের বাবারা কিছু টাকা দিয়েছিলেন। একজন তাঁর ছেলেকে দিলেন ১৫০ রুবল, অন্যজন দিলেন ১০০ রুবল। ছেলে দু'জন তাদের টাকা-কড়ি গুনে দেখল একত্রে মিলিয়ে ওদের টাকা বেড়েছে মাত্র ১৫০ রুবল। এটা কিভাবে হলো বলো তো?

৮৫. দুটো ড্র্যাফটের খুঁটি

দুটো বিভিন্ন রঙের ঘুঁটিকে ছকের ৬৪টি ঘরের যে কোনো জায়গায় রাখো। কতভাবে তাদের রাখা যেতে পারে বলো তো?

---

* গ্যালোস হলো শীতের দেশের জন্য তৈরি একরকম জুতো।

Scanned by CamScanner

৮৬. দুটো অঙ্ক

দুটো অঙ্ককে ব্যবহার করে সবচেয়ে ছোট পূর্ণসংখ্যা লেখা যায়?

৮৭. এক

দশটা অঙ্ককেই ব্যবহার করে ১ লিখতে পারো?

৮৮. পাঁচটা ৯

পাঁচটা ৯ দিয়ে ১০ লেখো। অন্তত দু'ভাবে করো এটা।

৮৯. দশটা অঙ্ক

দশটা অঙ্কের সব ক'টাকেই ব্যবহার করে ১০০ লেখো। এটা কতভাবে করা যায়? আমরা কিন্তু অন্তত পক্ষে চারটে নিয়ম জানি।

৯০. চারটে উপায়

পাঁচ বার একই অঙ্ককে ব্যবহার করে ১০০ লেখবার চারটে ভিন্ন ভিন্ন উপায় দেখাও তো!

৯১. চারটে ১

চারটে ১ দিয়ে সবচেয়ে বড় কোন সংখ্যাটা লেখা যায়?

৯২. মজার ভাগ

নিচের ভাগটায় ৪ ছাড়া সব সংখ্যাগুলোর বদলে লেখা হয়েছে। অজানা সংখ্যাগুলোকে পূরণ করো তো?

```
***) * * * * * * 8(* 8 * *
   - * * *
     * * 8 *
   - * * * *
     * * * *
   - * 8 *
       * * * *
   - * * * *
```

এই ধাঁধাটাকে অনেকভাবেই সমাধান করা যায়।

Scanned by CamScanner

৯৩. আর একটা ভাগ অঙ্ক

এই ধরনের আর একটা ভাগ অঙ্ক দেয়া হলো এখানে, তোমাকে শুধু সাতটা ৭ দিয়ে হিসেব শুরু করতে হবে।

```
* * * * ৭ * ) * * ৭ * * * * * * * *(* * ৭ * *
          -     * * * * * *
                * * * * * ৭ *
          -     * * * * * * *
                  * ৭ * * * *
          -         * ৭ * * *
               * * * * * * *
          -       * * * * ৭ * *
                  * * * * * *
          -         * * * * * *
```

৯৪. কতটা পাওয়া যাবে?

এক বর্গমিটারে যতগুলো বর্গমিলিমিটার আছে তা পাশাপাশি সাজালে কতটা লম্বা হবে? মনে মনে হিসেব করো তো?

৯৫. ঐ ধরনেরই আর একটা

এক ঘন মিটারে যত ঘন মিলিমিটার আছে তা একটার উপরে আর একটা সাজালে খুঁটিটা কত উঁচু হবে—মনে মনে বের করো তো?

৯৬. একটা উড়োজাহাজ

১২. মিটার ডানার বিস্তৃতিযুক্ত একটা উড়োজাহাজ যখন ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন তার ফটো নেয়া হলো। ক্যামেরাটির গভীরতা ১২ সেন্টিমিটার। ফটোতে উড়োজাহাজের বিস্তার উঠল ৮ মিলিমিটার।

যখন ছবিটা নেয়া হলো তখন উড়োজাহাজটা কত উঁচুতে ছিল?

৯৭. দশ লাখ জিনিস

একটা জিনিসের ওজন ৮৯.৪ গ্রাম। ঐরকম দশ লাখ জিনিসের ওজন কত মনে মনে হিসেব করো তো!

Scanned by CamScanner

৯৮. পথের সংখ্যা

৪৮ নং ছবিটা একটা গ্রীষ্মাবাসের নকশা, কতকগুলো রাস্তার ফলে বর্গক্ষেত্রে ভাগ হয়েছে। ক বিন্দু থেকে খ বিন্দুতে যেতে একজন লোক যে রাস্তাটা ব্যবহার করেছিল ফুটকি দেয়া রেখা দিয়ে তাই বোঝানো হয়েছে।

ক ও খ-র ভেতরে এটাই একমাত্র রাস্তা নয়। একই দৈর্ঘ্যের আর কতগুলো পথ হতে পারে?

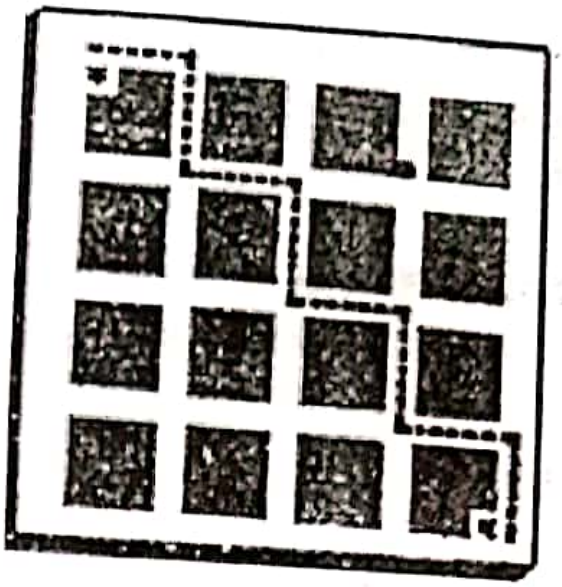

৪৮ নং ছবি। রাস্তা দিয়ে ভাগ করা গ্রীষ্মাবাসের নকশা

৯৯. ঘড়ির মুখ

একটা ঘড়ির মুখকে (৩৩ নং ছবি) যে কোনো ধরনের ছ'টা ভাগে ভাগ করতে হবে। কিন্তু প্রত্যেকটা ভাগের সংখ্যার যোগফল সমান হওয়া চাই।

এ ধাঁধাটা দিয়ে তোমাদের জ্ঞান আর উদ্ভাবনীশক্তির পরীক্ষা হবে।

৪৯ নং ছবি এই ঘড়ির মুখকে ছ'টা ভাগে ভাগ করতে হবে।

১০০. আট-মাথা তার

৫০ নং ছবিতে রেখাগুলোর সংযোগের জায়গায় যে ছোট ছোট বৃত্ত আছে সেগুলো

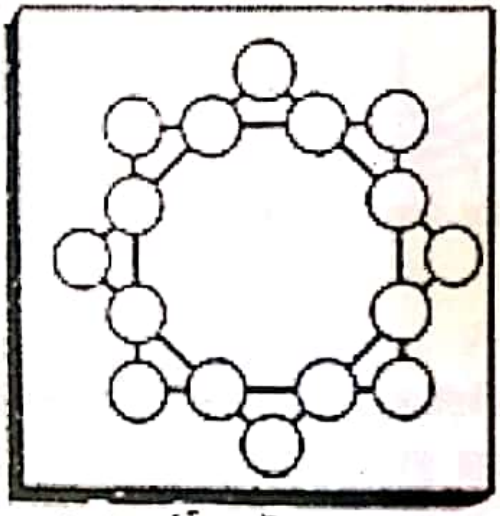

৫০ নং ছবি। আট-মাথা তারা।

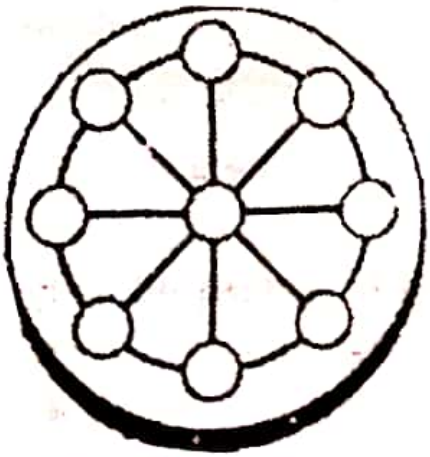

৫১ নং ছবি। সংখ্যা চক্র।

Scanned by CamScanner

১ থেকে ১৬ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে এমনভাবে পূর্ণ করো যাতে বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুতে লিখিত সংখ্যার যোগফল, আর শীর্ষবিন্দুগুলোতে লিখিত সংখ্যার যোগফল দুটোই হয় ৩৪।

১০১. সংখ্যা চক্র

৫১ নং ছবিতে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা এমনভাবে সাজাও যাতে কেন্দ্রে একটা সংখ্যা আর ব্যাসের দু'মাথায় অন্য সংখ্যাগুলো সাজালে প্রত্যেক ব্যাসের তিনটে করে সংখ্যার যোগফল হবে ১৫।

১০২. তেপায়া

তেপায়ার তিনটে পায়ের দৈর্ঘ্য ভিন্ন রকম হলেও তাকে নাকি ভালোভাবেই বসানো যায় এটা কি সত্যি?

১০৩. কোণ

৫২ নং ছবিতে ঘড়ির কাঁটায় কত ডিগ্রি কোণ তৈরি হয়েছে এটা মনে মনে সমাধান করতে হবে, কোনো মাপবার চাঁদা যন্ত্র ব্যবহার করা চলবে না।

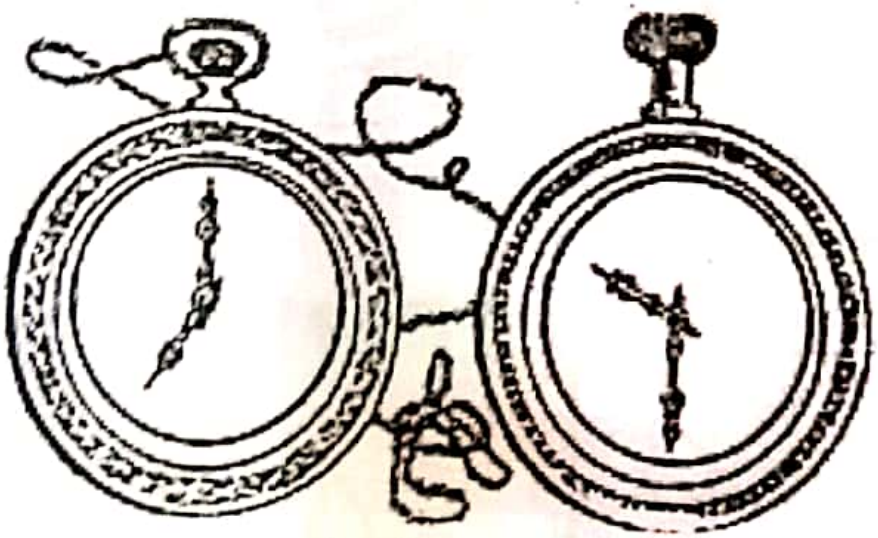

৫২ নং ছবি। ঘড়ির কাঁটায় কত ডিগ্রি কোনো তৈরি হয়েছে?

১০৪. বিষুবরেখার উপর

বিষুবরেখা বরাবর আমরা যদি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসি তাহলে আমাদের মাথা যে বৃত্তরেখায় ঘুরবে, তার পরিধি আমাদের পায়ের বৃত্তরেখার পরিধির চেয়ে বড় হবে। কিন্তু তফাৎ তখনি হবে?

Scanned by CamScanner

১০৫. ছ'টা সারি

ন'টা ঘোড়াকে কী করে দশটা আস্তাবলে রাখা হয়েছিল সেই মজার কথাটা তোমরা বোধহয় শুনে থাকবে? এখানে আর একটা ধাঁধা দিচ্ছি যা প্রায় একইরকম মনে হবে। তফাৎটা এই যে এটাকে সত্যিই সমাধান করা যাবে। ধাঁধাটা হচ্ছে :

২৪ জন লোককে এমনভাবে ৬টা সারিতে দাঁড় করাও যাতে প্রত্যেক সারিতে থাকবে ৫ জন করে।

১০৬. ভাগটা করবে কী করে?

ধাঁধাটা অনেকেরই জানা আছে : ৫৩ নং ছবিটাতে একটা আয়তক্ষেত্র থেকে তার সিকি ভাগ বাদ দেয়া আছে—এটাকে কী করে সমান চার ভাগে ভাগ করা যাবে? এটাকে তিনটে সমান ভাগে ভাগ করতে হবে, পারবে কি?

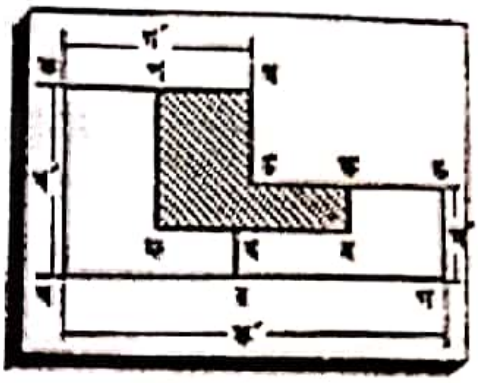

৫৩ নং ছবি। এই ক্ষেত্রটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করা যাবে কী করে?

১০৭. ক্রুশ আর চাঁদের ফালি

৫৪ নং ছবিতে একটা চাঁদের ফালির মতো চেহারা দেখতে পাচ্ছ। প্রশ্নটা হলো, এই চাঁদের ফালির সমান করে কিভাবে একটা লাল ক্রুশ আঁকা যাবে।

৭৯–১০৭ নম্বর ধাঁধার উত্তর

৭৯. মাত্র তিনটে আংটা খুলেই কাজটা করা যেতে পারে। একটা ভাগের সব ক'টা আংটা খুলে নিয়ে তাতে অন্য চারটা ভাগ যোগ করলেই হয়ে যাবে।

৫৪ নং ছবি। চাঁদের ফালিকে কিভাবে ক্রুশে 'পরিণত' করা যায়।

Scanned by CamScanner

৮০. প্রশ্নটা সমাধান করার আগে তোমাদের জানতে হবে মাকড়সা আর গুবরেপোকার ক'টা করে পা থাকে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের কথা মনে থাকলে নিশ্চয়ই জানো যে মাকড়সার থাকে ৮টা করে পা আর গুবরেপোকার ৬টা। ধরা যাক, বাক্সটাতে কেবল ৮টা গুবরেপোকাই ছিল। তার মানে এক্ষেত্রে থাকা উচিত ৬ × ৮ = ৪৮টা পা। ধাঁধাতে যে পায়ের সংখ্যা দেয়া হয়েছিল তা থেকে ৬ কম হলো এতে। যদি একটা গুবরেপোকার জায়গায় একটা করে মাকড়সার বদল করা যায়, তাহলে পায়ের সংখ্যাও ২ করে বেড়ে যাবে, কারণ মাকড়সার পা ৬টা নয়, ৮টা।

যদি তিনটে গুবরেপোকার বদলে তিনটে মাকড়সা ধরা হয় তাহলে বাক্সের মধ্যে পায়ের সেই ৫৪টা সংখ্যা পূর্ণ হবে—এটা তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাহলে ৮টা গুবরেপোকার জায়গায় হবে ৫টা, বাকিটা হবে মাকড়সা। ছেলেটি ৫টা গুবরেপোকা আর ৩টা মাকড়সা সংগ্রহ করেছিল। হিসেবটা মিলিয়ে দেখা যাক : ৫টা গুবরেপোকার ৩০টা পা আর ৩টা মাকড়সার ২৪টা পা তাহলে ৩০ + ২৪ = ৫৪।

ধাঁধাটা সমাধানের আরও একটা উপায় আছে। ধরে নেয়া যাক, বাক্সের ভেতর সব ক'টাই, অর্থাৎ ৮টাই ছিল মাকড়সা। তাহলে আমাদের থাকা উচিত ৮ × ৮ = ৬৪টা পা। অর্থাৎ ধাঁধাতে যা আছে তার থেকে ১০টা বেশি। একটা মাকড়সার বদলে একটা গুবরেপোকা নিলে পায়ের সংখ্যা ২ কমে যাবে। সবসুদ্ধ এভাবে আমাদের ৫ বার বদল করতে হবে, তাহলেই পায়ের সংখ্যা আমাদের দরকারমতো ৫৪-তে এসে নামবে। তার মানে হলো, ৮টা মাকড়সার ভেতর ৩টাকে আমরা বাক্সেই রেখে দেব, বাকিগুলোর জায়গায় রাখব গুবরেপোকা।

৮১. যদি একটা বর্ষাতি, একটা টুপি আর গ্যালোস জোড়ার বদলে তাকে শুধু দুই জোড়া গ্যালোস কিনতে হতো তাহলে দাম দিতে হতো ২০ রুবল নয়, দিতে হতো গ্যালোস দু'জোড়ার দাম, বর্ষাতি আর টুপির চেয়ে যত কম ততটা কম, অর্থাৎ ১৬ রুবল কম দিতে হতো। তাহলে দু'জোড়া গ্যালোসের দাম দাঁড়াচ্ছে ২০ − ১৬ = ৪ রুবল। তাহলে এক জোড়ার দাম ২ রুবল।

এখন আমরা জানি যে বর্ষাতি আর টুপির দাম একত্রে ২০ − ২ = ১৮ রুবল। একথা জানি যে টুপির চাইতে বর্ষাতির দাম ৯ রুবল বেশি। এখন আগের মতো যুক্তি দিয়েই অঙ্কটা করা যাক। একটা বর্ষাতি আর একটা টুপির বদলে দুটো টুপি কেনা যাক। সেক্ষেত্রে আমাদের ১৮ রুবল দিতে হবে না, দিতে হবে ৯ রুবল কম। তাহলে দুটো টুপির দাম ১৮ − ৯ = ৯

Scanned by CamScanner

রুবল, অর্থাৎ একটা টুপির দাম ৪ রুবল ৫০ কোপেক।
তাহলে, প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কত তা পাওয়া যাচ্ছে : গ্যালোস ২ রুবল, টুপি ৪ রুবল ৫০ কোপেক আর বর্ষাতি ১৩ রুবল ৫০ কোপেক।

৮২. ডিমের ব্যাপারি ২৯টা ডিমওয়ালা ঝুড়িটার কথাই—ভেবেছিল। ২৩, ১২ আর ৫ লেখা ঝুড়িতে ছিল মুরগির ডিম, আর ১৪ আর ৬ লেখা ঝুড়িতে ছিল হাঁসের ডিম।

উত্তরটা মিলিয়ে দেখা যাক। বিক্রির পর থাকবে।

$$২৩ + ১২ + ৫ = ৪০টা মুরগির ডিম$$

আর

$$১৪ + ৬ = ২০টা হাঁসের ডিম।$$

তাহলে ধাঁধা অনুযায়ী হাঁসের ডিমের চাইতে মুরগির ডিম থাকবে দ্বিগুণ।

৮৩. এখানে বুঝিয়ে বলার মতো কিছুই নেই। উড়োজাহাজটা উড়ে যায়; আবার সেটা ফিরে আসে একই সময়ে। কারণ ৮০ মিনিট আর ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট একই জিনিস।

ধাঁধাটা অন্যমনস্ক পাঠকের জন্যে দেয়া হয়েছে। সে হয়তো ভাবতে পারে যে ৮০ মিনিট আর ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটে কিছু তফাৎ আছে।

৮৪. এটায় চালাকি হলো এই যে, এর মধ্যে একজন বাবা, অন্যজন বাবার ছেলে। ধাঁধাটায় আছে ৪ জন নয়, মাত্র তিনজন লোক—ঠাকুর্দা, বাবা আর ছেলে। ঠাকুর্দা তাঁর ছেলেকে দিলেন ১৫০ রুবল, সে আবার নাতিটিকে তা থেকে দিল ১০০ রুবল (অর্থাৎ তার ছেলেকে)। তাহলে তার নিজের টাকা থাকল মাত্র ৫০ রুবল।

৮৫. একটা ঘুঁটিকে ৬৪টা ঘরের যে কোনোটাতেই রাখা যেতে পারে, অর্থাৎ এটাকে রাখবার ৬৪টা উপায় আছে। এটা যখন রাখা হয়ে গেল তখন দ্বিতীয়টাকে রাখবার মতো আর আছে মাত্র ৬৩টা ঘর। তার মানেই হলো, প্রথম ঘুঁটির ৬৪টা অবস্থার যে কোনোটার সঙ্গে দ্বিতীয় ঘুঁটিটার ৬৩টা অবস্থা যোগ করা যেতে পারে। তাহলেই ড্র্যাফটের ছকে দুটো ঘুঁটি রাখবার মতো $৬৪ \times ৬৩ = ৪০৩২$টা বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে।

৮৬. দুটো সংখ্যা দিয়ে যে ক্ষুদ্রতম পূর্ণসংখ্যা লেখা যায় তা কিন্তু ১০ নয়। কেউ কেউ হয়তো তাই ভেবেছ। কিন্তু এটা হবে ১, আর তা হবে এইভাবে :

১/১, ২/২, ৩/৩, ৪/৪ ইত্যাদি ৯/৯ পর্যন্ত

যাদের বীজগণিতের সঙ্গে পরিচয় আছে তারা অন্য ধরনের অঙ্কও দেখাতে পারবে :

Scanned by CamScanner

কারণ যে কোনো সংখ্যা শূন্য শক্তিতে উঠালে তা ১-এর সমান হয়।

৮৭. ১-কে দুটো ভগ্নাংশের যোগফল হিসেবে দেখাতে হবে :

$$১৪৮/২৯৬ + ৩৫/৭০ = ১$$

যারা বীজগণিত জানো তারা অন্য উত্তরও করতে পারো, যেমন :

$$১২৩৪৫৬৭৮৯^{০}; \; ২৩৪৫৬৭^{৯-৮-১}$$ ইত্যাদি।

৮৮. দুটো উপায় হলো এই রকম :

$$৯+৯৯/৯৯ = ১০ \text{ এবং } ৯৯/৯-৯/৯ = ১০$$

বীজগণিত জানা থাকলে, তোমরা বোধহয় আরও কয়েকটা উত্তর যোগ করবে এর সঙ্গে। যেমন :

$$(৯ \; ৯/৯)^{৯/৯} = ১০; \; ৯ + ৯৯^{৯-৯} = ১০$$

৮৯. এর চারটে সমাধান

$$৭০ + ২৪৯/১৮ + ৫৩/৬ = ১০০$$

$$৮০ \; ২৭/৫৪ + ১৯৩/৬ = ১০০$$

$$৮৭ + ৯ \; ৪/৫ + ৩ \; ১২/৬০ = ১০০$$

$$৫০ \; ১/২ + ৪৯ \; ৩৮/৭৬ = ১০০$$

৯০. ১, ৩, বা ৫-কে পাঁচবার ব্যবহার করে ১০০ লেখা তো সোজা। এখানে চারটে নিয়ম দেখা যাচ্ছে :

$$১১১ - ১১ = ১০০$$

$$৩৩ \times ৩ + ৩/৩ = ১০০$$

$$৫ \times ৫ \times ৫ - ৫ \times ৫ = ১০০$$

$$(৫ + ৫ + ৫ + ৫) \times ৫ = ১০০$$

৯১. লোকে সাধারণত বলে সংখ্যাটা হলো ১১১১। কিন্তু এর চেয়েও অনেক অনেক বড় সংখ্যা লেখা সম্ভব, যেমন $১১^{১১}$, অর্থা ১১-র ১১-ক্রম পর্যন্ত শক্তি ওঠালে যা হয়। যদি এটা শেষ পর্যন্ত হিসেব করার ধৈর্য তোমাদের থাকে (লগারিদ্‌মের সাহায্যে অনেক সহজেই তা করা যায়) তাহলে দেখতে পাবে এর উত্তর ২,৮০,০০,০০,০০,০০০-কেও ছাড়িয়ে যাবে। তাহলে সংখ্যাটা ১১১১ থেকে কোটি গুণ বেশি।

৯২. ধাঁধাটা চারটে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সমাধান করা যায়, যেমন :

Scanned by CamScanner

১৩,৩৭,১৭৪ : ৯৪৩ = ১৪১৮
১৩,৪৩,৭৮৪ : ৯৪৯ = ১৪১৬
১২,০০,৪৭৪ : ৮৪৬ = ১৪১৯
১২,০২,৪৬৪ : ৮৪৮ = ১৪১৮

৯৩. ধাঁধাটার একটি মাত্র সমাধান আছে :

৭,৩৭,৫৪,২৮,৪১৩ : ১,২৫,৪৭৩ = ৫৮,৭৮১*

শেষের বেশ কঠিন এই ধাঁধা দুটো প্রথমে আমেরিকায় 'শিক্ষা জগতে' (১৯০৬) ও 'গণিত পত্রিকা' সাময়িকীতে (১৯২০) প্রকাশিত হয়েছিল।

৯৪. এক বর্গমিটার ১০০০ হাজার বর্গমিলিমিটারের সমান। এক হাজার বর্গমিলিমিটারকে পাশাপাশি রাখলে তা ১ মিটার জায়গা জুড়ে থাকবে; ১০০০ হাজার বর্গ তাহলে জুড়ে থাকবে ১০০০ মিটার লম্বা জায়গা, তাহলে দাঁড়াচ্ছে ১ কিলোমিটার লম্বা।

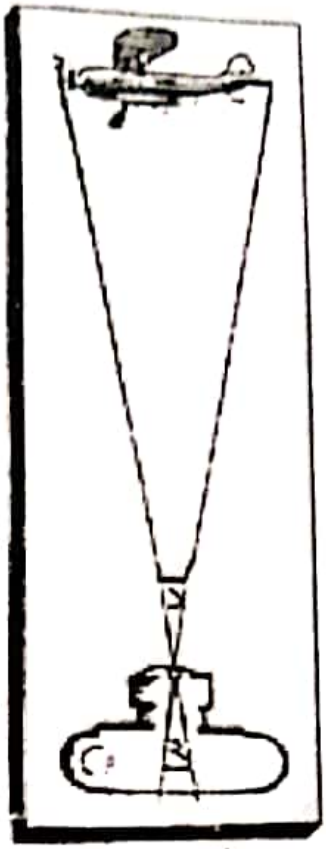

৫৫ নং ছবি

৯৫. উত্তরটা হতবাক করে দেবে। খুঁটিটা হবে ১০০০ কিলোমিটার উঁচু! এটা মনে মনে হিসেব করা যাক। এক ঘন মিটার ১০০০ ঘন মিলিমিটার × ১০০০ × ১০০০০-এর সমান। এক হাজার মিলিমিটারের ঘনক্ষেত্র একটার পর একটা সাজালে ১ মিটার উঁচু একটা খুঁটি হবে। এখন আমাদের আছে ১০০০ × ১০০০ গুণ ঘন। তাহলেই আমাদের খুঁটিটা হবে ১০০০ কিলোমিটার লম্বা।

৯৬. ৫৫ নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে (যেহেতু ১ নং আর ২ নং কোণ সমান) যে দৃষ্টবস্তুর রেখাগত মাপ আর ছবির ভেতর সেই অনুপাত রয়েছে, যা আছে লেন্স থেকে দৃষ্টবস্তু আর ক্যামেরার গভীরতার দূরত্বের ভেতরে। এক্ষেত্রে ক-কে উড়োজাহাজের উচ্চতা ধরলে (মিটারের হিসেবে) আমরা যে অনুপাতটা পাই তা হলো :

১২,০০০ : ৮ = ক : ০.১২

তাহলেই ক = ১৮০ মিটার।

---

* পরে এর আরও তিনটে সমাধান বের হয়েছে।

Scanned by CamScanner

৯৭. হিসেবটা কী করে মনে করা যায় তা দেয়া হলো। ৮৯.৪ গ্রামকে গুণ করতে হবে দশ লক্ষ দিয়ে, অর্থাৎ ১০০০ হাজার দিয়ে।

এটা দুটো ভাগে করা যাক :

৮৯.৪ গ্রাম × ১০০০ = ৮৯.৪ কিলোগ্রাম, কারণ এক কিলোগ্রাম এক গ্রামের ১০০০ গুণ বেশি তাহলে ৮৯.৪ কিলোগ্রাম × ১০০০ = ৮৯.৪ টন, কারণ এক টন হলো এক কিলোগ্রামের ১০০০ গুণ। তাহলেই আমাদের ওজনের হিসেবটা হবে ৮৯.৪ টন।

৫৬ নং ছবি

৯৮. ক থেকে খ-তে যাবার মোটমাট ৭০টা পথ আছে। (এই ধাঁধাটার নিয়মমাফিক সমাধান বীজগণিতের প্যাসক্যাল-এর ত্রিভুজের সাহায্যে করা যেতে পারে।)

৯৯. ঘড়ির উপর সংখ্যাগুলোর মোট যোগফল ৭৮, তাহলে ছ'টা ভাগে মোট সংখ্যা থাকবে ৭৮ : ৬ = ১৩ । এটাই প্রশ্নটাকে সমাধান করতে সাহায্য করবে (৫৭ নং ছবিতে এটা দেখানো হয়েছে)।

১০০-১০১. এদের সমাধান ৫৭ আর ৫৮ নং ছবিতে দেয়া হয়েছে।

১০২. তেপায়ার তিনটে পা সবসময়ই মেঝের উপর ঠিক হয়ে বসে, কারণ যে কোনো জায়গায় তিনটে বিন্দু দিয়ে একটিমাত্র 'তল' তৈরি হতে পারে। এজন্যেই তেপায়া বেশ শক্ত হয়েই বসে। দেখতে পাচ্ছ, এর কারণ মোটেই দৈহিক নয়, পুরোপুরি জ্যামিতিক। এর জন্যেই জমি পরিমাপের কাজে আর

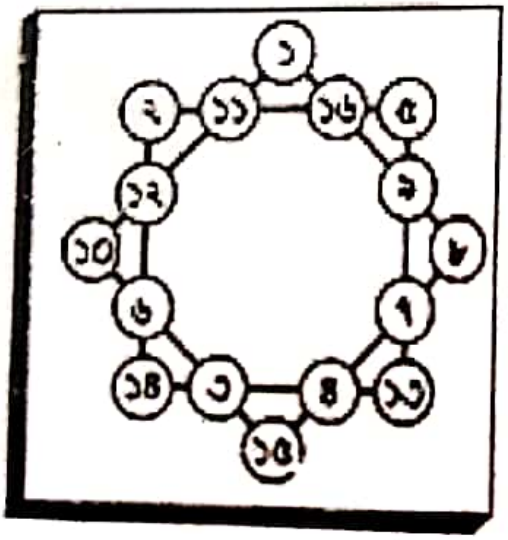

৫৭ নং ছবি

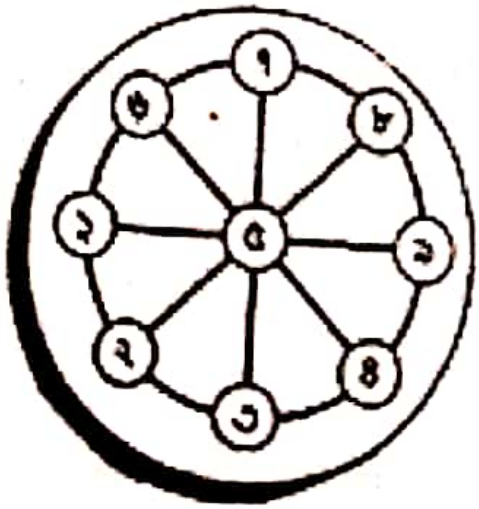

৫৮ নং ছবি

Scanned by CamScanner

ফটো তোলার ক্যামেরা রাখতে তেপায়াটা খুবই সাহায্য করে। চতুর্থ পা একে মোটেই শক্ত করবে না, বরং তাতে ঝামেলাই বাড়বে।

১০৩. ধাঁধাটার উত্তর সহজেই দেয়া যায়, বিশেষত ক'টা বেজেছে সেটা যদি একবার দেখো। ৫২ নং ছবির বাঁ দিকের ঘড়িটার কাঁটার দিকে তাকালেই দেখতে পাবে ৭টা বেজেছে। এর অর্থ হলো দুটো সংখ্যার ভেতরে বৃত্তচাপ পরিধির ৫/১২। ডিগ্রিতে দাঁড় করালে হয় : ৩৬০° × ৫/১২ = ১৫০°

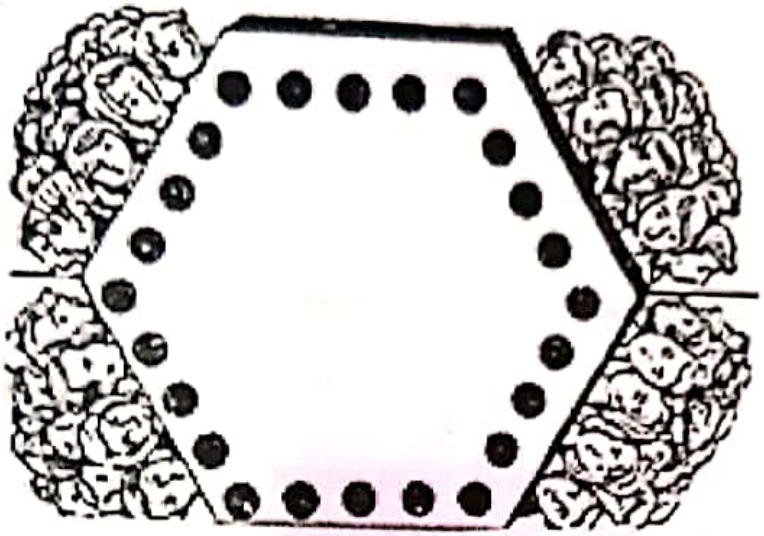

৫৯ নং ছবি

ডান দিকের ঘড়িটার কাঁটাতে দেখা যাচ্ছে ৯.৩০টা বেজেছে। এখানে বৃত্তচাপ $৩\frac{১}{২} \times \frac{১}{১২}$ পরিধির ৭/২৪-এর সমান।

ডিগ্রিতে দাঁড় করালে এটা হয় :

$$৩৬০° \times ৭/২৪ = ১৫০°$$

১০৪. যদি আমরা ধরে নিই যে মানুষের গড়পড়তা উচ্চতা ১৭৫ সেন্টিমিটার, আর ক-কে ধরি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, তাহলে ২ × ৩.১৪ × (ক+১৭৫)−(২ × ৩.১৪ × ক) = ২ × ৩.১৪ × ১৭৫ = ১১০০ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ ১১ মিটার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে উত্তরটা কোনোভাবেই পৃথিবীর ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং এটা সূর্যের মতো একটা বিরাট গ্রহের উপরই হোক বা ছোট বলের উপরই হোক উত্তরটা একই হবে।

১০৫. লোকগুলোকে একটা ষড়ভুজের আকারে দাঁড় করালে, ধাঁধাটার সমাধান করা সোজা হয়ে যাবে। ৫৯ নং ছবিতে এটা দেখানো হয়েছে।

১০৬. এই সমস্যাটার প্রধান আকর্ষণ হলো এই যে এক ক খ গ ঘ বা ঙ ধরে সমাধান করা চলবে না, নির্দিষ্ট উপায়েই এর সমাধান হবে। আসলে ৫৩ নং ছবিতে কালো জায়গাটাকে আমরা প্রত্যেকটা সাদা জায়গার সমান করতে

Scanned by CamScanner

চাই। বেশ দেখাই যাচ্ছে ফ ব রেখা খ গ রেখার থেকে ছোট। তাহলেই এটাকে ক খ-র সমান হতে হবে। অন্যদিকে, ফ ব-কে র গ-র সমান হতে হবে; তাহলে ফ ব = র গ = র্খ, সুতরাং খ র = র্ক − র্খ, কিন্তু খ র, প ফ এবং গ ঙ-এর সমান হওয়া উচিত। তার অর্থ হল : খ র = প ফ = গ ঙ, অর্থাৎ র্ক − র্খ = র্ঘ আর প ফ = র্ঘ।

তাহলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি র্ক, র্খ আর র্ঘ-খে খেয়ালখুশি মাফিক ধরলেই হবে না। র্ঘ বাহুকে র্ক এবং র্খ বাহুর বিয়োগফলের সমান হতে হবে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের দেখতে হবে সমস্ত বাহুগুলোই যাতে র্ক বাহুর নির্দিষ্ট অংশ হয়।

তাহলেই দাঁড়াচ্ছে : য র + প ফ = ক খ বা য র + (র্ক − র্খ) = র্খ, অর্থাৎ য র = য র্খ − র্ক। কালো অংশের বাহুগুলোর সঙ্গে ডান দিকের সাদা অংশের অনুরূপ বাহুগুলোকে তুলনা করলে দাঁড়াচ্ছে : য র = ব ভ, অর্থা য

র = ঘ $\frac{১}{২}$, সুতরাং ঘ$\frac{১}{২}$ = ২র্খ − র্ক। এই সমীকরণটা র্ক − র্খ = র্ঘ সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা পাচ্ছি র্খ = ৩/৫ র্ক। কালো অংশের সঙ্গে বাঁ দিকে সাদা অংশের তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে ক প ≡ ব ভ,

অর্থাৎ ক প = য র = ঘ$\frac{১}{২}$ = ১/৫ র্ক। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে প ঘ = য

র ≡ ১/৫ র্ক, সুতরাং ক ঘ = ২/৫ র্ক।

তাহলেই আমাদের ক্ষেত্রটার বাহুগুলো খেয়ালখুশি মাফিক হলে চলবে না, র্ক বাহুর নির্দিষ্ট অংশ (৩/৫, ২/৫ ও ২/৫) হতে হবে। একমাত্র এইভাবেই এর সমাধান সম্ভব।

১০৭. পাঠকদের মধ্যে যারা শুনেছ যে বৃত্তকে বর্গক্ষেত্রের সমান করা অসম্ভব, তারা হয়তো ভেবেছ জ্যামিতি দিয়েও এর সমাধান সম্ভব নয়। অনেকের মনে হবে

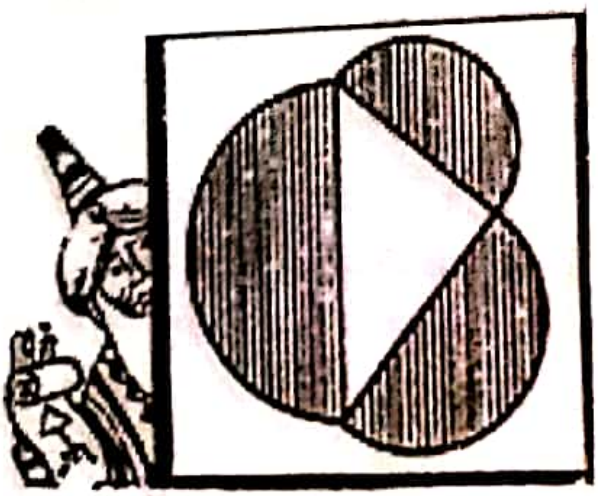

৬০ নং ছবি

৬১ নং ছবি

Scanned by CamScanner

একটা বৃত্তকেই যদি বর্গক্ষেত্রতে পরিণত না করা যায়, তাহলে দুটো চাপ দিয়ে তৈরি একটা অর্ধচন্দ্রকে কিভাবে আয়তক্ষেত্রে পরিণত করা যাবে?

কিন্তু জ্যামিতিক অঙ্কনের সাহায্যে সমস্যাটাকে ঠিকই সমাধান করা যায়। এজন্যে দরকার হয় বিখ্যাত পিথাগোরাসের উপপাদ্যের একটা মজার অনুসিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার। সেটা হলো : অতিভুজের উপর যে বৃত্তাংশ তৈরি করা যাবে, তা অন্য দুটো বাহুর উপরের বৃত্তাংশের যোগফলের সমান (৬০ নং ছবি)।

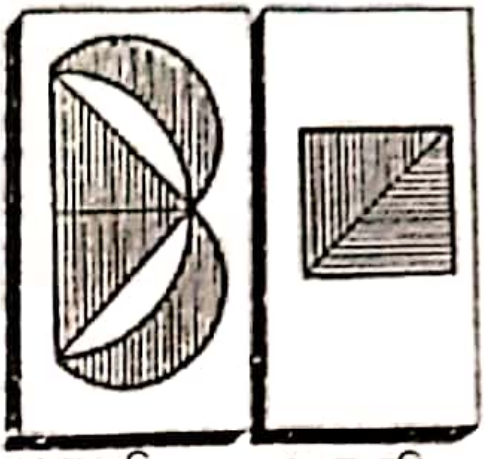

৬২ নং ছবি ৬৩ নং ছবি

বড় বৃত্তাংশটাকে যদি উল্টোদিকে ঘুরিয়ে ফেলা যায় (৬১ নং ছবি), তাহলে দেখা যাবে দুটো কালো অর্ধচন্দ্রকে একত্র করলে তা ত্রিভুজটির সমান হয়।* যদি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ নেয়া যায়, তাহলে এই দুটো অর্ধচন্দ্রের প্রত্যেকটা এই ত্রিভুজের অর্ধেক হবে (৬২ নং ছবি)। তাহলে জ্যামিতির সাহায্যে আমরা একটা সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তৈরি করতে পারি, যার ক্ষেত্রফল একটা অর্ধচন্দ্রের সমান হবে।

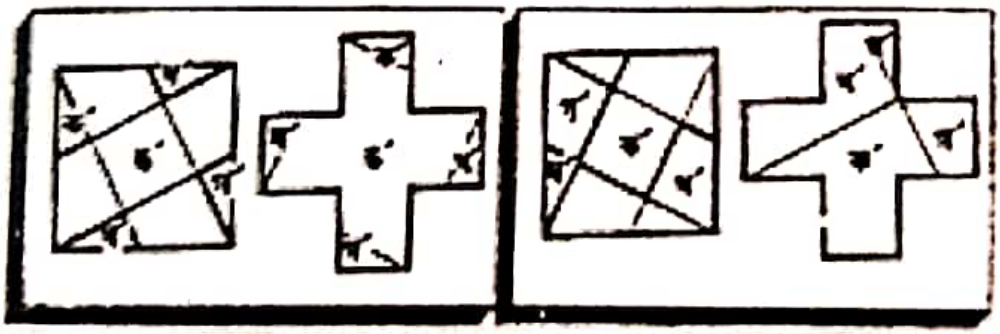

৬৪ নং ছবি ৬৫ নং ছবি

এখন যেহেতু একটা সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজকে সহজেই বর্গক্ষেত্রে পরিণত করা যায় (৬৩ নং ছবি), সুতরাং জ্যামিতির সাহায্যে অর্ধচন্দ্রটার বদলে একটা বর্গক্ষেত্রও তৈরি করা যাবে।

---

* জ্যামিতিতে এই সম্পর্কটাকে বলে 'হিপোক্রাটিসের ল্যুনিস'।

Scanned by CamScanner

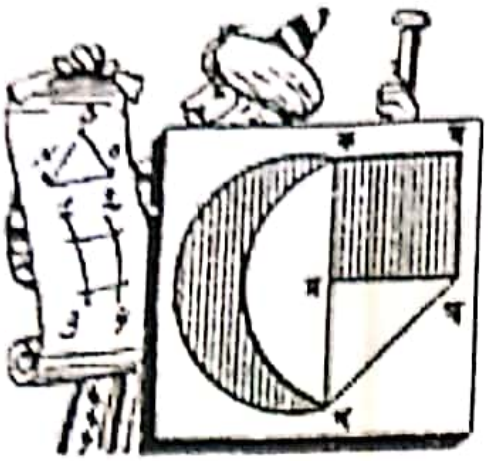

৬৬ নং ছবি

এখন যে কাজটা বাকি থাকল তা হলো এই বর্গক্ষেত্রটাকে একটা অনুরূপ ক্রুশে পরিণত করা (এটা তৈরি হবে ৫টা সমান মাপের বর্গক্ষেত্র দিয়ে)। এটা করার অনেক উপায় আছে; এর ভেতর দুটো দেখানো হয়েছে ৬৪ আর ৬৫ নং ছবিতে।

দুটোতেই বর্গক্ষেত্রের শীর্ষবিন্দু গুলোকে উল্টো দিকের বাহুর মধ্যবিন্দুর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কোনো অর্ধচন্দ্রকে এই মাপের ক্রুশে পরিণত করতে হলে পরিধির দুটো বৃত্তচাপ দিয়ে তা তৈরি হতে হবে। বাইরের বৃত্তচাপ বা বৃত্তাংশ আর ভেতরের বৃত্তচাপ হবে এর চেয়ে বড় ব্যাসার্ধের পরিধির এক-চতুর্থাংশ।*

কি করে একটা অর্ধচন্দ্রের সমান করে ক্রুশ তৈরি করতে হয় তা দেখিয়েছি তোমাদের। অর্ধচন্দ্রের দুটো মাথা (৬৬ নং ছবি) একটা সরলরেখা দিয়ে যোগ করা হয়েছে। এই সরলরেখার কেন্দ্র ম-তে একটা লম্বা খাড়া করে ম গ-কে = ম ক রা হলো। ম ক গ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজকে সম্পূর্ণ করা ম ক ঘ গ বর্গক্ষেত্র তৈরি করা হলো। এটাকে আবার ৬৪ বা ৬৫ নং ছবির যে কোনো একটি অনুসারে ক্রুশে পরিণত করা হলো।

---

* আকাশে আমরা যে অর্ধচন্দ্র দেখি তার চেহারায় একটু তফাৎ আছে। এর বাইরের চাপটা বৃত্তাংশ আর ভেতরেরটা উপবৃত্তের অংশ। শিল্পীরা অনেক সময় ভুল করে একে বৃত্তাংশ দিয়ে তৈরি করে থাকেন।

Scanned by CamScanner